মনি হায়দার

জিগোলো

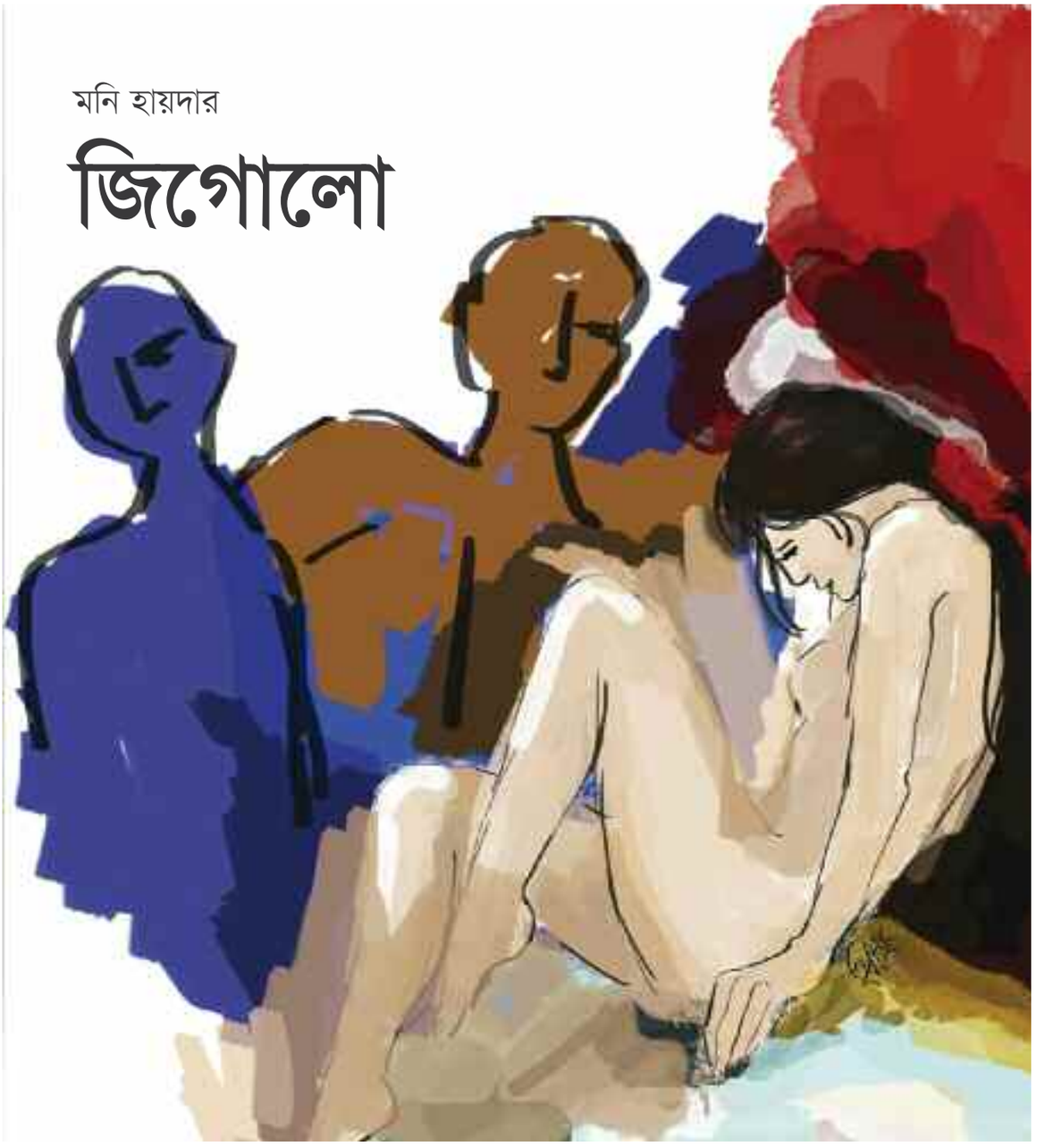

উপন্যাস

আপনি কে? আমাকে বলছেন? হ্যাঁ, আপনাকে বলছি। আগে আপনাকে দেখিনি কখনো। বলুনতো কে আপনি? আমি? হ্যাঁ আপনি। আমি মিরন মাহমুদ। এখানে, এই কবরস্থানে কেনো? মিরন নিজেকে সামলে নেয়, আমি মাঝে মধ্যে কবরস্থানে আসি। আমার মা বাবা লঞ্চ দুর্ঘটনায় মারা গেছেন প্রায় পনেরো ষোলো বছর আগে। নিজের হাতে কবর দিতে পারিনি। লাশও পাইনি। সেই বেদনা থেকে সময় পেলে আমি কবরস্থানে আসি, অন্যের মা বাবার কবরে মাটি দিয়ে সান্ত্বনা খুঁজি— গলাটা ধরে আসে।

তরঙ্গ বিচলিত তরঙ্গে হাত রাখে মিরনের কাঁধে, সরি। আমি এক্সট্রিমলি সরি। আসুন আমার সঙ্গে। আসুন... আমার মায়ের কবরে মাটি দিন। আপনার সঙ্গে আমিও দিচ্ছি...

কথার মধ্যে তরঙ্গের বেশ কয়েকজন বন্ধু, পরিচিতজন এসে জড়ো হয়। অনেকটা বেমানানভাবেই মিরন কবরস্থানে এসেছে। সাধারণত কোর্ট টাই পরে কেউ আসে না, বিশেষত কাউকে কবর দিতে। কিন্তু বিমান থেকে নেমে সরাসরি অফিসে গিয়ে পুরোনো পত্রিকা দেখতে দেখতে চোখ আটকে যায় একটা বিজ্ঞাপনের ওপর। মধ্যবয়স্ক হাসিমাখা মুখের একজন নারীর ছবির নিচে লেখা, গত সোমবার রাত এগারোটায় নিজ বাড়িতে মারা গেছেন সোফিয়া আখতার মিমি। মৃত্যুর সময়ে মিমির বয়স হয়েছিল সাতান্ন বছর। মরহুমার স্বামী বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মোখলেসুর রহমান। এই দম্পতির একমাত্র ছেলে তরঙ্গ রহমান ও একমাত্র মেয়ে রিমি। আগামীকাল দুপুরে মরহুমার ...।

আর পাঠ করে না মিরন। আচমকা এক শোকের সমুদ্রে ডুবে যায় ও। মনে হচ্ছে শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে ঘামতে থাকে একা একা...। রুমের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে নিজের মনে কথা বলে মিরন, তাহলে তুমি চলে গেলে? তোমার মতো আমাকে কেউ আর কোনোদিন ভালোবাসবে না। ভালোবাসা শেখাবে না..। আমি তোমাকে চিরদিন,

যতদিন বেঁচে থাকবো মনে রাখবো, খুব গভীরে, বুকের ভেতরে। তোমাকে নিবেদিত এই ভালোবাসা আমি ছাড়া আর কেউ কোনোদিন জানবে না। কেউ জানবে না...।
আপনাকে চেনা চেনা মনে হচ্ছে! কে আপনি?
হাসে মিরন, ম্যাডাম আমি একটু গান বাজনা করি। গিলোটিন চ্যানেল টিভি চ্যানেলে বছর খানেক আগে নতুন প্রতিভার খোঁজে নামে একটা অনুষ্ঠানে আমি আট নয় মাস গান গেয়েছিলাম।
রাইট, সোফিয়া আখতার মিমি হাসে, মনে পড়েছে। আপনার চুল এমন বড়ই ছিল। গান গাওয়ার সময়ে আপনার মাথা ঝাঁকুনি দিলে চুল কপালের চারদিকে ছড়িয়ে পড়তো।
অবাক মিরন, আপনি এতোসব লক্ষ্য রেখেছেন?
হাসে মিমি, কি আর করবো? সারা দিন বাসায় একা থাকি। সময় কাটে না। আর এক সময়ে গানও গাইতাম। এখন আর গাই না। কোথাও যেতেও পারি না। বাসায় বসে বসে টিভির রঙিন পর্দায় অন্যর গান শুনি আর দেখি—
আপনি গান গাইতেন?
মাথা নাড়ায় সোফিয়া আখতার মিমি, গাইতাম এক সময়ে।
এখন গান গাইছেন না কেনো?
ম্লান হাসে মিমি, চাইলেই কি সব পাওয়া যায়? যায় না। যায় না বলেইতো এখন একা একা গান গাই, আমি আমাকে শোনাই আমারই গান...বলতে বলতে আনমনে দরজা বন্ধ করতে যায়। বন্ধ করতে করতে হঠাৎ তাকায় মিরনের দিকে, দেখুনতো দরজা বন্ধ করে দিচ্ছিলাম। আমার যে কি হয়েছে!
আবার দরজা খুলে দাঁড়ায়। হাতে ধরা প্যাকেটটা দেখে, আমার ছেলে কানাডা থেকে পাঠিয়েছে। আপনার তো সই দরকার- দিন কাগজটা।
মিরন হাতের ভাউচার কপি বাড়িয়ে ধরে, এখানে একটা সই দিন।
খসখস করে সই করে মিরনের হাত থেকে কলম নিয়ে। মিলন ভাউচার হাতে নিয়ে ছিঁড়ে একটা কপি বাড়িয়ে দেয়, নিন আপনার কপি।
রিসিভ কপি হাতে নেয় মিমি, থ্যাঙ্ক ইউ। প্যাকেটটা নাড়াচাড়া করতে করতে আনমনে প্রশ্ন করে, কিন্তু আপনি এই ম্যাসেনজারের চাকরি করছেন কেনো?
সামনে রাখা ব্যাগটা হাতে নেয়, ম্যাডাম গরিবে জীবন! সব চাইলেই কি হয়?
কিন্তু একজন শিল্পী ম্যাসেনজারের কাজ কেনো করবেন?
উপায় না পেয়েই করছি।
লেখাপড়া করেননি?
মিরন হাতের ব্যাগটা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলে, খুব একটা করিনি। মানে করতে পারিনি। আর আমি কোনো কাজকেই ছোট করে দেখি না। এই যে কাজটা করি, ব্যাগে ভরে দেশ ও দেশের বাইরে থেকে আসা চিঠিপত্র বা প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বিলি করি, পৌঁছে দিই মানুষের কাছে, দুয়ার থেকে দুয়ারে... মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের সেতু তো গড়ে দিচ্ছি। এই যে আপনি আপনার প্রিয় পুত্রের চিঠি পেলেন, এসেছে সেই কানাডা থেকে, কতো আবেগ না আছে, আমিতো আপনার সেই আবেগের একটা সূত্র হতে পারলাম। সামান্য জীবনে আমার জন্য কম কি!
বাহ, আপনি তো দারুণ ব্যাখা দিলেন!
দিলাম আর কি! যাই ম্যাডাম। সাধারণত আমাদের মতো মানুষদের সঙ্গে কেউ গায়ে পড়ে কথা বলে না। দু-একটা প্রয়োজনীয় কথা বলেই শেষ করে দেয়। আপনি অনেক কথা বললেন। আপনাকে ধন্যবাদ। আসি?
আসুন।
মিরন গেটের কাছে যায়। মাথা নিচু করে শরীরের অর্ধেক বাইরে দিয়েছে, সোফিয়া আখতার মিমি দরজা পার হয়ে দ্রুত কাছে আসে, শুনুন।
গেটের বাইরে যাওয়া শরীরের অর্ধেক টেনে এনে সোজা হয়ে দাঁড়ায় মিরন, আমাকে বলছেন?
হ্যাঁ আপনাকে।
বলুন।
আপনার মুখ তো চিনলাম কিন্তু আপনার নামতো মনে নেই। কি নাম আপনার?
মিরন।
শুধু মিরন?
না, মিরন মাহমুদ।
হ্যাঁ এখন সব মনে পড়ছে। ভালো থাকুন।
আসি ম্যাডাম?
মাথা ঝাকায় মিমি, আসুন।
মিরন বের হয়ে দ্রুত হাঁটতে শুরু করে। কলাবাগানের এই বাড়িটার পরে তিনটি বাড়ির পর একটা বাসায় যেতে হবে। তাও ছয়তলায়। লিফট নেই। ছয়তলা পর্যন্ত সিঁড়ি ভেঙ্গে ওঠা সত্যি খুব কষ্টকর। কিন্তু উপায় নেই। প্যাকেটটা পৌঁছে দিয়ে সোজা বাসায়, মালিবাগ। মিরন যখন অফিস থেকে সকালে চিঠির প্যাকেট নিয়ে বের হয়, তখন মনমানসিকতা বেশ ভালো থাকে। কিন্তু চিঠি বা নানা ধরনের ডকুমেন্ট বিলি করতে করতে সময় গড়াতে থাকে, শরীরে ক্লান্তি ভর করে, তখন আর ভালো লাগে না। ইচ্ছে করে একটু বিশ্রাম নিতে। কিন্তু নেয় না। মনে মনে বলে, আমার হাতে কতো মানুষের জরুরি কাগজ আছে, হয়তো কারো চাকরির নিয়োগপত্র আছে, পৌঁছে দিলে, হাতে পেলে মানুষটি খুব খুশি হবে। মানুষের মনে আনন্দ বা সুখ তৈরি করার মধ্যেও একটা দায় অনুভব করে।
মিরন দুপুরের পর নিজেকে সামলে নিয়ে অফিস থেকে বের হয়। ড্রাইভারকে বিদায় করে নিজেই গাড়ি ড্রাইভ করে চলে আসে কলাবাগানে। মেইন রাস্তা থেকে গলির ভেতরে গাড়ির গতি কমিয়ে দেয়। মিনিট চারেক চালাবার পর 'অর্কিডহাউস' নামের বাড়িটার সামনে গিয়ে আবার পিছিয়ে এসে, একটু দূরে গাড়িটা পার্ক করে। গাড়ি বন্ধ করে নামে। তাকায়, বাড়ির সামনে তেমন ভিড় নেই। দু-চারজন মানুষ বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ঝটলা করছে। বাড়ির গেট খোলা।
গলির মোড়ে একটা চায়ের দোকান। সামনে দুটো ছোট ছোট বেঞ্চ পাতা। ধীরে ধীরে এসে বসে একটা বেঞ্চে মিরন। তাকায় দোকানদার, সঙ্গে সঙ্গে মিরন এক কাপ চায়ের অর্ডার দেয়।
দুধ চা? না রঙ চা?
আদা আছে?
আছে।
তাহলে আদা দিয়ে রঙ চা দিন। চিনি একটু বেশি দেবেন।
চাঅলা চা বানাচ্ছে।
সিগারেট আছে? থাকলে একটা সিগারেট দিন।
চাঅলা চা বানানো বাদ দিয়ে সিগারেট বাড়িয়ে ধরে, সিগারেট নেন।
হাত বাড়িয়ে সিগারেট নিতে নিতে মিরন জিজ্ঞেস করে, ও বাড়িতে কেউ মারা গেছে নাকি?
হ, বাড়ির মালিক মারা গেচে।
কবে মারা গেছে?
এইতো দুই দিন অইবে, চায়ের কাপ বাড়িয়ে ধরে চাঅলা—এহনও মাডি দেয় নাই।
চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলে, কেনো?
হের পোলাতো থাহে বিদেশে। হুনচি কালকাই আইবো। পোলা আওনের পর মাটি দেবে।
আচ্ছা! চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে সিগারেটে টান দেয় মিরন। কিন্তু সবই বিস্বাদ লাগে। মনে হচ্ছে বমি হবে। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে চাঅলাকে বলে, আমাকে আরও এক প্যাকেট সিগারেট দিনতো।
চাঅলা দ্রুত এক প্যাকেট সিগারেট বের করে দেয়, নেন।
সিগারেটের প্যাকেট হাতে নিতে নিতে জিজ্ঞেস করে, ওই বাড়ির মৃত মালিকের স্বামী নাই?
অবাক চাঅলা, কেমন কতা কন? স্বামী থাকবে না ক্যান? বিরাট বড় লোক হের স্বামী। গারমেনস আছে, টিভি চ্যানেল আছে, গরুর খামার আছে। মোকলেসুর রহমান নাম হোনেন নাই?
মাথা নাড়ায় মিরন, হ্যাঁ শুনেছি।
মাঝে মাঝে হেরে টিভিতেও দেহায়।
আমিও দেখেছি, চায়ের কাপে চুমুক দেয় মিরন।
হঠাৎ চাঅলা গলা বাড়িয়ে ডানে বামে তাকিয়ে নিচু স্বরে বলে, তয় ব্যাটার খাইসলত ভালো না। এই বউটারে বিয়ার আগেও একটা বউ ছিল। হেই বউ রাইখা এই বউ আনছে বছর দশেক অইবে। আবারও একটা নতুন বিয়া করছে। কম বয়সী মাইয়া। হেও গান গায় টিভিতে। চাদ সুলতানা।
চাঅলা হাসে, তয় লোকটার পছন্দ আছে। চাদ সুলতানা দেখতে হোনতে

মাসাল্লাহ, জব্বর।
দোকানের দিকে অর্কিডহাউস থেকে দুজন লোককে আসতে দেখে চাঅলা একেবারে অন্য মানুষ। নিজেকে গুটিয়ে দোকানের ভিতরে নিয়ে যায়। লোক দুজন এসে বসে পাশের বেঞ্চে।
সুলতান ভাই, দু কাপ চা দাও।
দিতাছি জিল্লুর ভাই। চাঅলা চা বানাতে বানাতে তাকায় জিল্লুরের দিকে, ম্যাডামের কয়বর কবে দেবেন?
আগামীকাল।
তরঙ্গ ভাই আইবে না?
হ্যাঁ আজ রাতে পৌঁছে যাবে।
মিরন মনে মনে প্রার্থনা করে, ব্যাটা চাঅলা যদি জিজ্ঞেস করতো, কোথায় দেবে কবর, খুব ভালো হতো। মনের কথাটা টের পেয়েই বোধহয় সুলতান জিজ্ঞেস করে, কোতায় কবর দেবেন?
বনানী কবরস্থানে।
সুলতান চায়ের কাপ বাড়িয়ে দিতে দিতে আপন মনে বলে, বড় লোকগো কয়বরস্তান!
চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে তাকায় জিল্লুর, মানে?
সুলতান বুঝতে পারে কথাটা বলা ঠিক হয়নি। নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, মনে নিয়েন না কিছু জিল্লুর ভাই। মুখ দিয়া বাইর অইয়া গেছে। তয় কথাটাতো হাচাই।
সত্যি হোক আর মিথ্যা হোক, কথাটা তুমি ভালো বলোনি। তরঙ্গ আসুক—
ভাই আমারে মাফ কইরা দেন, সুলতান হাত জোড় করে।
ঠিক আছে, বিরক্তির সঙ্গে দাঁড়ায় জিল্লুর। পকেট থেকে টাকা বের করে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট ফেলে দিয়ে সঙ্গের লোকটাকে টেনে নিয়ে চলে যায়। সুলতান পঞ্চাশ টাকার খুচরো হাতে নিয়ে তাকায়, জিল্লুর নেই। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মিরনের দিকে তাকায়, আপনে কন আমি কি মিছা কতা কইছি?
না, আপনি একদম সত্যি কথা বলেছেন। কিন্তু এই জিল্লুর কে?
তরঙ্গ ভাইর চাচাতো ভাই।
মিরন চা সিগারেটের দাম দিতে দিতে জিজ্ঞেস করে, ওনাকে এতো ভয় পাচ্ছেন কেনো?
আরে ভাই, বড় লোকদের কতো খেলা থাহে জানেন? তরঙ্গ ভাই যদি হোনে আমি এই কতা কইচি, কষ্ট পাইবো। এই দোকানতো হের লাইগা দিতে পারতেছি। তিন বচ্ছর আগে আমার দোকানতো এই এলাকার মাস্তানরা উঠাইয়া দিতে চাইছিল। তহন এই তরঙ্গ ভাই আমারে শেল্টার দিছে।
বলতে হয়, তরঙ্গ ভালো মানুষ।
হ, বড় ভালো মানুষ— এক হাজার নোট ভাঙ্গিয়ে খুচরো টাকা দিয়ে দেয় সুলতান। মিরন টাকা হাতে নিয়ে গাড়ির দিকে যায়।
বাড়িতে কে কে আছে তোমার?
সোহানা আখতার মিমির বুকের মধ্যেখানে, দুই কবুতরের মাঝখানে মিরন মাহমুদের মুখ। দুজনেই নগ্ন। কিছুক্ষণ আগে দুটি শরীর মিলেমিলে একটি শরীরে রূপান্তরিত হয়েছিল। শরীরের ভেতরে যে শরীরের কষ থাকে, ছন্দ থাকে, বের করেছে দুজনে। অনেক দিবস রজনীর পর সোহানা আখতার মিমির শরীর গাঙ্গে তুফান তুলেছে কামনার চিৎকার। মিমির বয়স পঞ্চাশ পার হয়েছে আরও তিন বছর আগে। খুব যত্ন করে নিরিখ না করলে এতোটা বয়স বোঝা যায় না। শরীর অটুট এখনও। মাথায় অনেক চুল। হ্যাঁ চামড়ায় ঈষৎ ভাঁজ পড়েছে। কিন্তু একটু সাজলে এখনও মিমিকে অনেক দূর নিয়ে যাওয়া যায়।
বাড়িতে আমার অই অর্থে কেউ নেই, আবার সবাই আছে, বুকের খাদ থেকে মুখ বাইরে আনে মিরন। দুজনার শরীর একটু আগলা হয়। মিমি কাঁৎ শুয়ে। আর মিরন চিৎ। মাথার নিচে দুজোড়া হাত। উদোম চওড়া বুক। হালকা পশম।
মানে?
বাড়িতে বাবা মা একটা বোন আছে। কিন্তু জীবনের প্রয়োজনে যখন কাউকে পাওয়া যায় না, তখন থেকেই কী লাভ?
ঘটনা কী বলো...
বাবা জন্ম থেকে কৃষক। কিন্তু খুবই প্রান্তিক। আমার বাবার যে জমি সেই জমিতে তিন মাসেরও খোরাক হয় না। ফলে, সেই শৈশব থেকে বাবাকে দেখেছি হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করতে। পরের জমিতে হালচাষ করে বাবা খুব ক্লান্ত আর বিষাদগ্রস্ত হয়ে ঘরে ফিরলে, আমার খুব খারাপ লাগতো। খুব ইচ্ছে করতো ক্লান্ত বাবার শরীরে হাত বুলিয়ে দিতে, কিন্তু পারতাম না। মা চিরকালের টানাটানির সংসারের একজন মহান গৃহিণী। সংসারের সবচেয়ে আনন্দ আমার ছোট বোনটা, রতনা। আমার খুব ইচ্ছে জীবনের সকল সুখের বিনিময়ে ওকে সুখী করতে পারতাম যদি! বুকের অতল থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস উঠে আসে।
আহারে! মিরনকে জড়িয়ে শুয়ে পড়ে পাশে।
আহারে বললে কেনো? পাল্টা জড়িয়ে ধরে মিরন।
তোমার আর আমার শৈশবটা একইভাবে কেটেছে মিরন।
মানে? আমার মতো তোমারও কেউ ছিল না?
অর্ধেক ছিল, অর্ধেক ছিল না।
বাবা ছিল, মা ছিল না?
না, বাবা ছিল না, মা ছিল। বাবা বেচারা মারা যাবার সময়ে আমার বয়স সাত কি আট বছর। বাবা ছিল স্কুল মাস্টার। খুব চমৎকার দিন ছিল আমার। যদিও স্কুল মাস্টারের একমাত্র মেয়ে আমি কিন্তু ছিলাম রাজার মেয়ের মতো।
মিমিকে বুকের উপর থেকে ছেড়ে পাশে উপুর শোয় মিরন, রাজার মেয়ে কথার অর্থ কী?
আমার বাবার মধ্যে কবিত্ব ছিল। খুব খেয়ালি এবং আবেগী মনের মানুষ বাবা আমাকে অসম্ভব ভালোবাসতো। বলা যায়, জন্মের পর থেকে আমি বাবার কোলেই মানুষ হয়েছি। আমার গোসল, আমার সাজানো, আমার খেলনা, আমার লেখাপড়া সব বাবা করতো। মা রান্না করতো আর বাবা মেয়ের খুনসুটি দেখে হাসতো। বাবারা ছিলো তিন ভাই। বাবা মোহন সর্দার হঠাৎ মারা গেলে আমার সব সুখ হারিয়ে যায়। সেই শৈশবে বাবা আমার জন্য হারমোনিয়াম কিনেছিলো। হারমোনিয়াম বাজিয়ে নজরুল সঙ্গীত গাইতো বাবা। সব চেয়ে প্রিয় গান ছিল, খেলিছো হে বিশ্বালয়ে বিরাটও শিশু আনমনে...। বাবার ভীষণ শখ ছিল বড় হলে আমার গলায় গান শুনবে। আমিও বাবার সঙ্গে দু-একটা গান গাইতাম। এই যেমন নজরুল সঙ্গীত...নয়ন ভরা জলগো তোমার আচল ভরা ফুল...। তো সেই বাবা যখন মারা গেলো আমার জীবন, মায়ের জীবন অথৈ পাথারে পড়লো।
কেনো? বাবা যখন স্কুল মাস্টার, খুবতো কষ্ট হওয়ার কথা ছিল না।
ছিল না কিন্তু বাবার যে দুজন ভাই ছিল। বাবার ছোট ভাই আমাদের সবটুকু সুখ কেড়ে নেয়ার জন্য নেকড়ের মতো প্রস্তুত ছিল। এবং সুযোগের চমৎকার ব্যবহার করলো। আমার ছোট চাচা ছিল মায়ের ন্যাওটা। অনেকটা ছোট ভাইয়ের মতো। কিন্তু বাবা মারা যাওয়ার পর সেই ছোট চাচা হয়ে উঠলো ছোট দাঁতাল নেকড়ে। মানুষ কতো হিংস্র আর নির্মম হতে পারে সেই শৈশবেই বুঝেছি।
তোমাদের তাড়িয়ে দিতে চাইলো?
না, দখল করতে চাইলো।
দখল?
হ্যাঁ দখল।
কি রকম?
আমার এখন, এই জীবনের বেলায় এসে ধারণা জন্মে যে, আমার বাবা জানতো মারা যাবে।
জন্মের পর মৃত্যু অনিবার্য সবাই জানে।
এটাতো চিরন্তন সত্য। কিন্তু আমি বলছি আমার বাবার মৃত্যু সম্পর্কে। মারা যাওয়ার বছর খানেক আগে বাবা মায়ের নামে পাঁচ কাঠা জায়গা রেখেছিল। দলিল মায়ের হাতে দিয়ে বলেছিল, কখন মরে যাই বলা তো যায় না। তোমাকে তো কিছু দিতে পারলাম না, সামান্য জমিটুকু দিলাম। মা খুব রাগ করে বলেছিল, তুমি বেঁচে থাকতে কেনো আমার নামে জমি রাখলে?
বাবা হাসতে হাসতে বলেছিল, আমাকে ওই জমিতে কবর দিয়ো।
দখল কীভাবে হলো তোমার মা?
আমার দাদা তখনো জীবিত। বয়স ধরো নব্বই বছর। চোখে কম দেখে। হাটে লাঠি নিয়ে। কিন্তু শয়তানের আব্বা ছিল লোকটা। আমার বাবা মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দাদা ছোট চাচাকে প্ররোচিত করলো মাকে বিয়ে

করতে।
তোমার ছোট চাচা রাজি হলো?
সঙ্গে সঙ্গে রাজি হলো। আমার মা সুন্দরী।
তাই?
হ্যাঁ।
তোমার চেয়েও সুন্দরী ছিল?
আমার মাকে আমার সঙ্গে তুলনায় আনবো না। কিন্তু বলছি, মা যথেষ্ট সুন্দরী ছিল। শরীরের রঙ ছিল হালকা সাদা। মাথা ভরা চুল। আর হাসলে টোল পরতো গালে। চোখ দুটো ছিল ধূসর।
তাহলে তো সুন্দরীই ছিল। তোমার চাচার ঘটনা বলো।
মাকে বিয়ে করতে রাজি হলেও একটু লজ্জা পেলো না, তেমন নয়। যে নারীকে বড় বোনের মতো শ্রদ্ধা করতো তাকেই বিয়ে করলো বয়সের ব্যবধান থাকার পরও।
সুন্দরী হলে যা হয় আর কী!
হাসে মিমি, সত্যি বলছি আমার মা আমার চেয়েও সুন্দরী ছিলেন। আর পুরুষ হয়ে পুরুষের ব্যাকরণ নিশ্চয়ই জানো। দ্বিতীয় কারণ, বাড়ির সামনে ওই পাঁচ কাঠা জমি। মা যদি বাড়ি ছেড়ে বাপের বাড়ি চলে আসে সঙ্গে সঙ্গে ওই জমিও হাত ছাড়া হয়ে যাবে। ছোট চাচা মায়ের শরীর এবং পাঁচ কাঠা জমি হাত ছাড়া করতে চায়নি। মজার ঘটনা কি জানো, মায়ের দ্বিতীয় বিয়ের ব্যাপারে আমার তিন মামাও কোনো রা করেনি। মামারা সব শুনে সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়েছে। মা এই বিয়েন বিরুদ্ধে কথা বলতে গেলে, মামারা কথাও শুনতে চায়নি।
কেনো?
আমিতো তখন অতোসতো বুঝতাম না। যতো বড় হয়েছি, তত বুঝেছি মানুষের মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা লোভ আর স্বার্থের হাঙ্গর ক্ষুধার প্রকাশ।
কি রকম?
আমার মা যদি দ্বিতীয়বার বিয়ে না করে দেবরকে, মা যদি চলে যায় বাবার বাড়ি, মামারা আর একটা উটকো ঝামেলায় পড়বে না? সঙ্গে আমার মতো একটা অকাজের মেয়ে!
বুঝেছি, মিরন দুহাতে তুলে ধরে মিমির মুখ, তাকায় গভীর আয়াত চোখে, বলে, তোমাকে দেখে মনেই হয় না মিমি তোমার ভেতর দিয়ে দুঃখের নহর বয়ে যাচ্ছে। এতো কষ্ট করে কীভাবে টিকে আছো? চুমু খায় সোহানা আখতার মিমি কামনামাখা ঠোঁটে। চুমু খেতে খেতে নিজের জিহ্বা ঢুকিয়ে দেয় মিমির মুখগহব্বরে। মিমিও দুহাতে ঝাঁপটে ধরে মিরনকে।
মিরন ও মিমির মধ্যে এই ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিল আরও ছয় মাস আগে।
মিরন ধানমন্ডির তিন নম্বর সড়কের ফুটপাত ধরে হাঁটছে। খুঁজছে একটা বাড়ির ঠিকানা। হাতে চিঠি। হঠাৎ পাশে একটা গাড়ি থামে। গাড়ির কাচ নেমে একটা মুখ উঁকি দেয় মিরন?
মিরন থমকে দাঁড়ায় এবং তাকায়। এক মুহূর্ত মাত্র, চিনতে পারে সোহানা আখতার মিমিকে। এগিয়ে যায় কাছে, আপা কেমন আছেন?
ভালো। আপনি কেমন আছেন?
চলে যাচ্ছে আর কি! পথে পথে মানুষের ঠিকানা খুঁজে বেড়ালে আর কতোটুকু ভালো থাকা যায়। তবুও ভালো আছি। এদিকে কোথায় এসেছেন?
ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম।
কি হয়েছে আপনার? একটু ব্যাকুলতা দেখায় মিরন মাহমুদ।
মিরন মাহমুদের এই ব্যাকুলতাটুকু খুব ভালো লাগে মিমির। জিজ্ঞেস করে, তাড়া কেমন আপনার?
কীসের তাড়া?
কাজের। মানে আপনার চিঠি বিলি করা কি শেষ?
হাতের চিঠিটি দেখায়, আজকের মতো এটাই শেষ চিঠি। কেনো আপা? ঠিকানা কাছের না দূরের?
মনে হচ্ছে সামনের একটা কি দুটো বাড়ির মধ্যে ঠিকানা পেয়ে যাবো।
তাহলে চিঠিটা বিলি করে আসুন। আমি অপেক্ষা করি।
আমার জন্য অপেক্ষা করবেন?
মৃদু হাসে মিমি, হ্যাঁ আপনার জন্য অপেক্ষা করবো। আপনি চিঠিটা বিলি করে আসুন। আমি সামনের দিকে এই রাস্তার মাথায় লেকের পারে যাচ্ছি গাড়ি নিয়ে। দেখে নিন আমার গাড়ি রঙ বেগুনি। গাড়ি পার্ক করে আমি বাইরেই থাকবো। আসলে দেখা হবে। আসুন...আপনার সঙ্গে আমার জরুরি কথা আছে।
ঠিক আছে আপা, চিঠিটা বিলি করে আসছি। দ্রুত হাঁটতে শুরু করে মিরন।
মিরন দ্রুত চলে যায় সামনের দিকে। কিন্তু মাথার মধ্যে ভাবনার ডালপালা মেলে, এই সুন্দরী মহিলা আমার জন্য অপেক্ষা করবে কেনো? মাস দুয়েক আগে বিদেশ থেকে আসা ছেলের চিঠি বিলি করতে গিয়েছিলাম, সেই সূত্রে পরিচয়। সামান্য কথাবার্তা। ওইরকম কথা তো পথেঘাটে কতো মানুষের সঙ্গে প্রতিনিয়ত হচ্ছে, কেউ কী আর মনে রাখে? হ্যাঁ এই মহিলা টিভির রিয়েলিটি শোয়ে আমাকে গান গাইতে দেখেছে, এইতো! ঘটনা কী হতে পারে? কেনো আমার জন্য অপেক্ষা করবে? কোনো অশুভ বার্তা নয়তো? ভাবনার মধ্যে মিরন এসে দাঁড়ায় চিঠির ঠিকানায়, বাড়ির সামনে। দারোয়ানের কাছে চিঠিটি দিয়ে দ্রুত হাঁটতে থাকে লেকের দিকে। মিনিট পাঁচেক হাঁটার পরই দেখতে পায় মিরন, ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে আছে লেকের পারে গাড়ির সঙ্গে ঠেস দিয়ে। মহিলার শারীরিক কাঠামো বেশ মজবুত। কাঁধের দুই পাশে কালোজাম রঙ চুল ঝুলছে। সামনে দাঁড়ালে হাসে সোহানা আখতার মিমি, এখন কোথায় যাবেন?
বাসায় যাবো।
বাসা কোথায় আপনার? মিমির কথায় প্রবল আন্তরিকতার টান অনুভব করে মিরন।
আমি থাকি মালিবাগের ভেতরে, একটা মেসে।
মেসে থাকলে তো সমস্যা নেই—
মানে?
নিজের বাসাতো নয় যে কেউ অপেক্ষা করবে! আছে নাকি অপেক্ষার কেউ, মিমির গলায় তরল আনন্দ। আমাকে বলতে পারেন।
মিরন হিসাব মেলাতে পারে না। মিমি কেনো আমাকে এতো ঘনিষ্ঠভাবে কথা বলতে চাইছে? আমাকে নিয়ে কী কোনো পরিকল্পনা আটছে? হতে পারে, নগর জীবনে অবাক অবাক ঘটনা ঘটে। আমি কী সেই অবাক ঘটনার অংশ হতে যাচ্ছি? আমার কী চলে যাওয়া উচিত? কিন্তু ভদ্রমহিলাকে আমার ভালোও লাগতে শুরু করেছে। বাসার গেটে, ওনাকে যেমন ঘুমন্ত রাশভারী মনে হয়েছিল, এখন মনে হচ্ছে উচ্ছল আকর্ষণীয় এক নারী। সেদিন পরেছিল ম্যাক্সি। আজকে পরেছে সবুজ জমিনের হালকা লাল পাড়ের শাড়ি। কানে ঝুমকো। হাতে অনেক গাছি কাঁচের চুড়ি। আজকাল কাঁচের চুড়ি পরেই না শহরের নারীরা। মুখে কোনো লিপিস্টিক নেই। হালকা সাজ কিন্তু অপরূপ লাগছে। ধূস শালা, আমি এসব ভাবছি কেনো?
কী হলো, কী ভাবছেন? সোনিয়া আখতার মিমি তাড়া দেয়।
না কিছু ভাবছি না।
না ভাবলে আমার কথার উত্তর দিচ্ছেন না কেনো?
কী কথার উত্তর চান আপনি?
মেসে আপনার জন্য কেউ অপেক্ষা করে আছে কি না!
হাসে মিরন, নাহ। আমার নাগরিক জীবনে একাই আছি আমি।
চলুন, ওই বেঞ্চের উপর বসা যাক।
সামনে, লেকের পার ঘেঁষে বসার একটা বেঞ্চ। আশেপাশে কোনো লোকজনও নেই। দূরে, রাস্তার পাশে একটা চায়ের দোকান। দূরে, মেইন রাস্তার উপর দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে শা শা শব্দে। দুজনে বেঞ্চের উপর পাশাপাশি বসে। মিরন তাকিয়ে আছে লেকের পানির দিকে। লেকের ওই পারে নৌকায় উঠেছে একটা ছেলে আর একটা মেয়ে। ছেলেটা মেয়েটাকে বুকের সঙ্গে ঝাঁপটে ধরে বৈঠা বাইছে। মেয়েটা বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসছে। নারী ও পুরুষের পৃথিবীতে কতো রকমের যে রঙ আছে!
শুনুন মিরন, আপনাকে আমি অনেক দিন ধরে খুঁজছিলাম, অনেকটা আপন মনে কথা বলছে মিমি, এইভাবে অন্যদিকে তাকিয়ে কিন্তু মিরনকে শুনিয়ে বলছে সোহানা আখতার মিমি।
আমাকে খুঁছছিলেন? অবাক মিরন মাহমুদ।
হ্যাঁ, কিন্তু আপনার কোনো ঠিকানা জানা ছিল না, তাই... থেমে একটু হাসে মিমি, কিন্তু দেখুন চাইলেই পাওয়া যায়। আপনাকে আমি মন দিয়ে খুঁজছিলাম। এবং আমার ধারণা ছিল, আপনাকে আমি পাবো।
কিন্তু কেনো খুঁজছিলেন আপনি?

মিরন, আপনি এই চাকরিতে কতো বেতন পান?
আমার বেতন দিয়ে আপনি কী করবেন?
আহা শুনিই না... অবশ্য বলতে যদি আপত্তি থাকে তাহলে থাক।
না, আমার কোনো আপত্তি নেই। আমি মাত্র বারো হাজার টাকা পাই।
মাত্র বারো হাজার টাকা?
ঘাড় ঝাঁকায় মিরন, উপায় নেই আমার। আমাকে সহায়তা করার মতো কেউ নেই সংসারে। এক বৃদ্ধা ফুপু আছে, আমার মা বেঁচে আছে, দুজনকে টাকা পাঠাতে হয়। নিজে এই শহরে বেঁচে থাকার ব্যাপার আছে। বেঁচে থাকার জন্য টাকার মতো জরুরি ঈশ্বর আর কী আছে?
বুঝেছি, দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে সোনিয়া আখতার মিমি। তাকায় গভীর চোখে মিরনের দিকে, আমি একটা কাজের প্রস্তাব দিতে চাই। আমি জানি কাজটা অন্যরকম কিন্তু প্রচুর টাকা ইনকামের সুযোগ আছে। নিজেও মজা পাবেন, টাকাও পাবেন...।
হা মুখে তাকিয়ে থাকে মিরন, কী বলছে মহিলা? টাকাও পাবেন মজাও পাবেন। মজার সঙ্গে টাকা পাওয়া যায়, জানা নেই।
আমি ঠিক আপনার কথা বুঝতে পারছি না।
না পারার কথা, কারণ এই পেশাটা অভিনব কিন্তু নতুন না।
মানে?
পেশাটা আগেও ছিল। শুনেছি প্রাচীনকালেও এই পেশার লোকজন ছিল।
কিন্তু পেশাটা কী? প্রবল কৌতূহলে ফেটে পড়তে চাইছে মিরন মাহমুদ।
আপনি কী জানেন মেয়েরা যেমন বেশ্যাগিরি করে, তেমন করে ছেলেরাও? মিরনের চোখের উপর চোখ রাখে সোফিয়া আখতার মিমি।
আঁতকে ওঠে মিরন, না। আমি জানি না।
কিন্তু আমি জানি, আস্থার সঙ্গে বলে সোফিয়া আখতার মিমি, পৃথিবীতে সেক্সটা পুরুষের একচেটিয়া কোনো বিষয় নয়। যদিও পুরুষেরা মনে করে সেক্স মানেই পুরুষের পৃথিবী। কিন্তু ঠিক না, সেক্স যেমন পুরুষের তেমন নারীরও। ধরুন, পৃথিবীতে কোনো নারী নেই। কেবলই পুরুষ। ভাবুনতো কী ঘটবে অনন্য এই পৃথিবীতে? পুরুষের হাহাকারে দুনিয়া মাতাল হয়ে যাবে। আবার ভাবুন বিপরীত দৃশ্য। দুনিয়াজুড়ে শুধু নারী আর নারী। অজস্র সুন্দরী নারী। কোটি কোটি রূপবতী নারী। কিন্তু কোথাও কোনো পুরুষ নেই। কী হবে নারীদের? হাহাকারে হাহাকারে মরে যাবে না? কার জন্য সাজবে নারী? গাইবে গান? জীবনটাইতো বৃথা। তাহলে নারী ও পুরুষের পরস্পরের যে সম্পর্ক, কি সেই সম্পর্ক? হ্যাঁ অবশ্যই সম্পর্কটা প্রেমের তো বটেই, প্রেম শব্দটার আড়ালে লুকিয়ে থাকে সেক্স। কিন্তু পাশবিক সমাজ আর প্রথাবদ্ধ সংসারের কারণে নারীর সেক্স সব সময়েই আড়ালে থেকেছে। কিন্তু নারীরও শরীরে কামনার আগুন আছে। জানা গেছে, অধিকাংশ পুরুষ নারীর শরীরের কাছে হেরে যায়... তখন নারী বিকল্প খোঁজে। কিন্তু পুরুষের জন্য যেমন নির্দিষ্ট করে বেশ্যালয় তৈরি করে নিয়েছে পুরুষেরা, অতৃপ্ত রক্তাপ্লুত নারীরা কোথায় যাবে? যাবার কোনো জায়গা নেই। সবই পুরুষতান্ত্রিকতার মোড়কে নারীর সকল পথ আটকে দিয়েছে। তখন নারী নিজের ঘরের ভেতরে সিঁদ কাটে। বাড়ির আশেপাশের ছেলে বা পুরুষদের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক গড়ে তোলে...
আপনি এসব আমাকে শোনোচ্ছেন কেনো? বিকেলের মৃদুমন্দ লেকের হাওয়ায় ঘেমে যায় মিরন মাহমুদ।
মিরনের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসে মিমি, কারণটা খুব পরিষ্কার। আমি গত কয়েক বছর ধরে একজন পুরুষকে খুঁজছিলাম। যাকে আমি টাকার বিনিময়ে ব্যবহার করতে পারি, অবশ্যই শারীরিকভাবে।
আপনার সেই পুরুষ আমি?
আমার মনে হয়েছে, আপনি কাজটা করতে আগ্রহী হবেন।
রাগে ক্রোধে খান খান হয়ে ফেটে পড়তে চাইছে মিরন মাহমুদ। কিন্তু একধরনের অশরীরী ভয়ে শরীর স্থবির হয়ে যায়। এই মহিলা, সামনের এই মহিলা, যার গাড়ি আছে, বাড়ি আছে, ঐশ্বর্য আছে, সেই মহিলা আমাকে পুরুষ বেশ্যা বানাতে চায়? কতো বড় সাহস? হ্যাঁ হতে পারে আমি দরিদ্র, আমি ঢাকা শহরের এই প্রান্ত থেকে সেই প্রান্তে ঘুরে বেড়াই মাত্র দশ হাজার টাকার জন্য। অবশ্য একটু আগে আমি আমার সামনে বসা সোনিয়া আখতার মিমিকে বলেছি বারো হাজার টাকা। নিজেকে একেবারে ছোট করতে ইচ্ছে করছিল না আমার। সে কারণেই আমি দুই হাজার টাকা বাড়িয়ে বলেছি। মনে হচ্ছিল দশ হাজার টাকার চেয়ে বারো হাজার টাকা একটু উঁচু লেভেলের। সে যাই হোক, সামনের বসা এই মহিলাকে কেটে টুকরো টুকরো করতে পারলে আমার ভীষণ ভালো লাগতো। কিন্তু আমি জেলে যেতে চাই না।
আমি বুঝতে পেরেছি মিরন, আপনি আমার উপর রেগে আছেন।
আ আ মি বুঝতে পারছি না, আ আ পনি আমাকে এই নোংরা কাজের প্রস্তাব দিলেন কী করে? আর আমাকেই বা কেনো? রাগে তোতলায় মিরন।
আপনি উত্তেজিত হবেন না, মুখের ডানায় ঝুলে আছে মৃদু সোনালি হাসি। আমাকে অপমান করে আপনি হাসছেন?
না, আমি হাসছি না। মিরন, আপনি আমার মুখের দিকে তাকালে মনে হবে আমি হাসছি। আসলে আমার মুখটাই এমন... এবার দাঁত বের করে হাসতে থাকে। মিমির হাসিমাখা মুখের দিকে তাকাতে চায় না মিরন, কিন্তু হাসিটা বড় সংক্রামক। সুন্দর। আকর্ষণীয়। জীবনে এই প্রথম কোনো নারী এতো কাছে বসে হাস্যরসে কথা বলছে। তাও আবার শরীর কারখানার গোপন অভিসার নিয়ে। পরিচয় মাত্র একদিনের, তাও হঠাৎ। গোটা ঘটনাটা মিরনের মনে হচ্ছে কোনো নাটক। কী করবে, কী বলবে বুঝে উঠতে পারছে না। দুপুর গড়িয়ে সময় যাচ্ছে বিকেলের দিকে। পেটে খিদে জানান দিচ্ছে।
আপনার খিদে পেয়েছে না মিরন? জিজ্ঞেস করে মিমি।
অবাক মিরন, মহিলা জানলো কীভাবে? না জানার কোনো কারণ নেই। দুপুরের পর পরই দেখা, খাওয়া হয়নি। যে কোনো বুদ্ধিমান নারী সহজেই বুঝতে পারে এইসব।
কি ভাবছেন? খিদে লাগেনি আপনার? আমার লেগেছে।
আমারও লেগেছে। কিন্তু আমি বাসায় মানে মেসে যাবো। মেসে আমার দুপুরের খাবার দেয়া আছে। না খেলে নষ্ট হয়ে যাবে, একটানা বলে থামে মিরন। হালকা বাতাসে শরীর ও মুখের ঘাম কিছুটা হলেও কমেছে।
হাসে আগের মতো সোফিয়া আখতার মিমি, আমি জানি আপনি না গেলে দুপুরের খাবারটা নষ্ট হবে। আমিও চাই না, কোনো খাবার হোক যতো সামান্যই নষ্ট হোক। কারণ, জগৎ জুড়ে মানুষের এই যে দৌড়, এই লড়াই, কেবলমাত্র একমুঠো খাবার বা ভাতের জন্য। তারপরও মানুষ কখনো কখনো ইচ্ছের বিরুদ্ধে অনেক কাজ করে। আজ না হয় আমার সঙ্গে একবেলা খেলেন। নাকি আমার প্রস্তাব শুনে আমাকে ঘৃণা করছেন! কি বলবে, বুঝে উঠতে পারে না মিরন মাহমুদ। একধরনের করাতে কাটতে থাকে। মহিলার প্রতি ঘৃণা যে হচ্ছে না, অস্বীকার করতে পারে না। আবার মহিলার প্রস্তাবের মধ্যে একধরনের সুখও অনুভব করছে মিরন। সেক্সের বিনিময়ে টাকা!
কথা বলছেন না কেনো?
সোফিয়া আখতার মিমির দিকে তাকায় মিরন, আসলে কী বলবো আমি বুঝতে পারছি না।
চলুন, দুপুরের খাওয়া দাওয়া করি, পরে ভেবে দেখা যাবে— মিমি উঠে দাঁড়ায়। গাড়ির কাছে যায়। গাড়ির দরজা খুলে দাঁড়ায়, আসুন।
মিরন যন্ত্রচালিত যন্ত্রের মতো গাড়ির কাছে আসে এবং পিছনের দরজা খোলার জন্য হাত বাড়ায়। হাসে সোনিয়া আখতার মিমি, আপনি পিছনে বসবেন কেনো? সামনে আসুন, আমার পাশে বসুন।
মিরন গাড়ির পিছনের দরজা ছেড়ে সামনে চলে আসে। মিমির মেলে ধরা দরজা দিয়ে গাড়ির ভিতরে প্রবেশ করে বসে। মিমি ঘুরে এসে নিজেকে গাড়ির ভেতর ঢুকিয়ে ট্রাস্ট দেয়। গাড়ি সামনের দিকে চলতে শুরু করে। সামনে স্থির তাকিয়ে থাকে মিরন। কিছুই দেখে না। সব চোখের দৃষ্টির উপর দিয়ে যাচ্ছে। গাড়ি প্রধান সড়কে ওঠে। দক্ষ হাতে গাড়ি ড্রাইভ করে মিমি। গাড়ি চালানোর সময়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে রাস্তার উপর। গত পনেরো বছর ধরে নিজে গাড়ি চালায় কিন্তু কখনো কোনো দুর্ঘটনায় পড়েনি। গাড়ি থামে বত্রিশ নম্বর রোডের মুখে এসে, সিগন্যালে। তাকায় মিরনের দিকে মিমি। মিরন সামনের দিকে পাথরের চোখে তাকিয়ে আছে। খুব মায়া হয় মিরনের মায়ামাখা বিধ্বস্ত মুখটাকে দেখে। জীবনের কাছে কতো মানুষ কতো প্রক্রিয়ায় হেরে যায়, মিরনও হেরে যাবে, জানে সোনিয়া আখতার মিমি। টাকার কাছে মিরন হেরে যাবে। না গিয়ে উপায় নেই। টাকাই মানুষের সকল জয় ও পরাজয়ের উৎস।
সিগন্যাল ছেড়ে দেয়, মিমি গাড়ি ঢুকিয়ে দেয় রাসেল স্কোয়ারের দিকে। প্রচণ্ড ভিড় গাড়ি ও মানুষের। ধীরে ধীরে গাড়ি চালাতে হচ্ছে মিমিকে।

স্কয়ার হাসপাতাল পার হয়ে গাড়ি ঢোকে গ্রিন রোডে। গ্রিন রোডের মাঝখানে চমৎকার খাবারের একটা হোটেল হয়েছে, নামটাও সুন্দর, হাওয়াই মিঠে। খাবারের রেস্টুরেন্টের নাম কেনো হাওয়াই মিঠে বোঝা মুশকিল। খাবারদাবার মানুষ যা খায়, সবইতো মিলে যায় মাটির সঙ্গে, হাওয়ায় না মিশে গেলেও মিশে তো যায়...। সেই কারণেই কী! একবার খাওয়া দাওয়ার পর বিল দিতে গিয়ে ক্যাশে বসা ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করেছিল মিমি।

জবাবে ম্যানেজার বলেছিল, জানি না। মালিকের যা ইচ্ছে রাখছে, আমার কী!

বিশাল বিল্ডিংয়ের নিচে পার্কিং এরিয়া। অনেক কষ্টে সোনিয়া আখতার মিমি গাড়িটা পার্ক করতে পারে। পার্ক করে গাড়ি থেকে নামে মিমি। সঙ্গে সঙ্গে নামে মিরন মাহমুদও। গাড়ি লক করে সিঁড়ির দিকে হাঁটতে থাকে মিমি। অনুসরণ করে মিরন। সিঁড়ি বাইছে মিমি আগে আগে, পিছনে পিছনে মিরন। মিমির পরনে শাড়ি। এক সিঁড়ি থেকে আর এক সিঁড়িতে পা রাখার সময়ে মিমির পাছায় অদ্ভুত একটা ঢেউ খেলে যায়, মিরন ঢোক গেলে আর মিমির পাছার ঢেউ দেখতে দেখতে উপরে ওঠে। তিনতলায় প্রায় চার হাজার স্কয়ার ফুটের বিশাল রেস্টুরেন্ট, হাওয়াই মিঠে। সামনে সারি সারি খাবার টেবিল। সামনের খাবারের টেবিল পার হয়ে ভেতরে গেলে পাওয়া যায়, ছোট ছোট রুম। একেকটা রুমের আলাদা আলাদা নাম। মৌসুমী, পালঙ্ক, খেয়া, উর্বশী, ঝরনাধারা, সবুজপত্র... আরও আরও নাম। মিমি আর মিরন ঢোকে খেয়া'য়। দুটি চেয়ার, মাঝখানে সুদৃশ্য টেবিল। দুজনে বসে মুখোমুখি। রুম ইচ্ছে করেই ছোট বানানো হয়েছে, যাতে দুজন মানুষ, পরস্পর মুখোমুখি কেবল নয়, শরীরের সঙ্গে শরীরের ভাব বিনিময় করতে পারে। মিরন লম্বা মানুষ। পা ছড়িয়ে দিলে মিমির পায়ের সঙ্গে লেগে যায়, মিরন পা সরিয়ে নেয়। কি দেবো আপনাদের? ওয়েটার এসে দাঁড়ায়। সামনে বাড়িয়ে ধরে মেনু কার্ড।

কার্ড হাতে নিয়ে তাকায় মিমি, কি খাবেন? এখানে সাদা ভাত, নানা রকমের মাছ আর ভর্তা পাওয়া যায়। আমি মাংস খাই না। আপনি চাইলে খেতে পারেন।

আমি সাদা ভাত, ডাল আর গরুর মাংস খাবো।

ওকে, মেনু কার্ড ওয়েটারের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে বলে সোনিয়া আখতার মিমি, উনি যা চেয়েছেন দিন। আমাকে ভর্তা আর ভাত দিন। যদি ইলিশ মাছ থাকে, দিতে পারেন।

আছে ম্যাম, শরষে ইলিশ।

গুড, সঙ্গে শরষে ইলিশ দিন।

ওয়েটার চলে যায়। দুজনে মুখোমুখি। পেটের খিদেটা বেশ জানান দিচ্ছে মিরন মাহমুদের। মোবাইলের দিকে তাকিয়ে দেখে, বাজে তিনটে পঁচিশ। খিদের আর দোষ কী? যেখানে দেড়টা থেকে দুটোর মধ্যে দুপুরের খাবার খায়, সেখানে দেড় ঘণ্টা লেট।

আপনি এতো গম্ভীর কেনো? মৃদু হাসির সঙ্গে প্রশ্ন করে সোনিয়া আখতার মিমি।

কই নাতো—

দেখুন মিরন, আপনি অযথা ভাবছেন। আমি আপনাকে একটা প্রস্তাব দিয়েছি মাত্র, আপনাকে জোর করছি না, বাধ্যও করছি না। আপনি ভেবে দেখুন আমার প্রস্তাবটা। আপনি যেখানে মাসে মাত্র বারো হাজার টাকা বেতন পান, সেই বেতনের জন্য আপনাকে দিন রাত পথে পথে হাঁটতে হয়, মানুষের দরজায় দরজায় যেতে হয় কিন্তু আপনি আমার প্রস্তাব মানলে, মাসে তিন থেকে চার দিন সময় দিলে আপনি পাবেন বিশ হাজার টাকার কাছাকাছি। এমনকি বেশিও হতে পারে। সেই সঙ্গে পাবেন শারীরিক সুখ।

ওয়েটার খাবারের ট্রে নিয়ে সামনে দাঁড়ালে মিমি কথা থামিয়ে, ওয়েটারের হাত থেকে ট্রে নিয়ে খাবারের বাটি ও প্লেট নামিয়ে টেবিলের উপর রাখে। খালি ট্রে নিয়ে চলে যায় ওয়েটার। খুব যত্নের সঙ্গে মিরনের প্লেটে ভাত দেয়। সঙ্গে গরুর মাংস। নিজেও নেয় পাতে। দুজনে খেতে শুরু করে। কিন্তু করোটির বিভ্রান্ত চিন্তা থেকে বের হতে পারে না মিরন। কেবল একটাই প্রশ্ন নিজের মনে আউড়ে যাচ্ছে, আমার সামনেরই নিপাট ভদ্রমহিলা আর কতোজনকে এই প্রস্তাব দিয়েছে?

শুনুন মিরন, মুখে মাংস দিয়ে চিবুতে চিবুতে তাকায়, আমার সঙ্গে কাজ

করলে আপনি ঠকবেন না। হয়তো ভাবছেন এ কেমন পেশা? পুরুষেরা এসব করে নাকি? করে, প্রাচীন ইতিহাস ঘাটলে পাবেন।
আমাকেই কী আপনি প্রথম টার্গেট করেছেন?
হাসে মিনি, টেবিলের উপর রাখা গ্লাস থেকে পানি পান করে, জানি আপনি বিশ্বাস করবেন না। তবুও বলছি, আমি প্রথমই আপনাকে বলেছি বা আপনার কথায় টার্গেট করেছি। আমি প্রায় একা বাসায় থাকি। দেখেছেন বাড়িটা কতো বড়। কাজের লোক এসে কাজ করে চলে যায়। একমাত্র ছেলে থাকে বিদেশে। স্বামী এই শহরেই থাকে, আমার সঙ্গে দেখা হয় কালেভদ্রে।
কেনো?
ওর কাছে আমি পুরোনো হয়ে গেছি। ও শিল্পপতি, কোটি কোটি টাকার মালিক...প্রতিদিন কতো নারী, বিশেষ করে ভার্জিন মেয়ে ওর আশেপাশে ঘোরে। ওর চাইতে হয় না, ওইসব নারীরা সব খুলে অপেক্ষায় থাকে... কখন ডাকবে আমার স্বামী।
আপনার স্বামীর নাম কী?
রিয়াজুর রজমান অলোক।
খাওয়া বন্ধ করে তাকিয়ে থাকে সোফিয়া আখতার মিমির দিকে মিরন। মিরনের তাকিয়ে থাকা দেখে মিটি মিটি হাসে মিমি।
কী চমকে গেছো?
হ্যাঁ কেবল চমকাইনি, ভয়ও লাগছে।
ভয় লাগার যথেষ্ট কারণ আছে। রিয়াজুর রহমান অলোকের সরকারের সঙ্গে চমৎকার বোঝাপাড়া আছে। প্রচুর টাকা ডোনেট করে সরকারকে। সেসব আমি জানি। কিন্তু আমিতো ওনার চ্যানেল গিলোটিন নাম্বার ওয়ান আয়োজত রিয়েলেটি শোয়ে গান গেয়েছিলাম।
জানি তো। আমিও তোমাকে ওই চ্যানেলের রিয়েলেটি শো এ গান গাইতে দেখেছি। সরি আপনাকে তুমি বললাম। কিছু মনে করবেন না।
মিরন মাহমুদের খাওয়া শেষ, আমি চলে যাবো। গলা গম্ভীর।
ঠিক আছে, যাবেন। আমিতো আপনাকে আটকে রাখিনি। খাবারের বিলটা দিয়ে এক সঙ্গে নামি। নইলে ওরা অন্যরকম ভাবতে পারে।
ওকে, মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানায় মিরন।
ওয়েটার বিল নিয়ে এলে সোনিয়া আখতার মিমি ব্যাগ খুলে এক হাজার টাকার নোট দেয়। বিল হয়েছে সাতশ বিশ টাকা। ওয়েটার ক্যাশে যাওয়ার জন্য ফিরলে মিমি বলে, রির্টানের দরকার নেই।
ওয়েটার ফিরে মাথা নুইয়ে কৃতজ্ঞতার হাসি উপহার দেয়।
চলুন, দাঁড়ায় মিমি। সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়ায় মিরন। দুজনে এক সঙ্গে খেয়া থেকে বের হয়ে সিঁড়ির দিকে যেতে থাকে। সিঁড়ির মাথায় দেখা হয়ে যায় মিমির বন্ধু তামান্না তাবাসসুমের সঙ্গে। তামান্না তাবাসসুম নাচের শিল্পী। টানা টানা শরীর। শরীরের রঙ দুধে আলতা। পটলচেরা চোখ। মাথায় এক মাথা চুলের উঁচু বিনুনী। শাড়ির গিট নাভীর অনেক নিচে। পিপাসার্ত পেটের অর্ধেক দেখা যাচ্ছে। সঙ্গে আরও দুটি মেয়ে।
কী রে মিমি? কেমন আছিস?
ভালো, দুজনে হাক করে, লাঞ্চ করতে এসেছিস নাকি?
হ্যাঁ, সঙ্গে মেয়ে দুজন দেখিয়ে বলে, আমার নাচের স্কুলে নতুন ভর্তি হয়েছে। খুব ভালো নাচে। টেলিভিশনে একটা অনুষ্ঠানে বিজয়ী হয়েছে ওরা। সেলিব্রেট করতে এলাম, তাকায় পাশে দাঁড়ানো মিরনের দিকে, কে?
আমার ছোট ভাই, মিরন। তাহলে তোরা সেলিব্রেট কর, আমরা যাচ্ছি।
ওকে, তামান্না তাবাসসুম আর মেয়ে দুটি সামনের দিকে যায়। সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে থাকে মিমি আর মিরন মাহমুদ। নিচে নেমে গাড়ির কাছে যেতেই মিরন বলে, আমি এখন যাই।
আপনাকে নামিয়ে দিই?
না, প্রয়োজন নেই। আমি একা যেতে পারবো, সামনের দিকে হাঁটতে শুরু করে মিরন।
শুনুন, পিছন থেকে ডাকে সোনিয়া আখতার মিমি।
বলুন, দূরে দাঁড়িয়েই কথা বলে মিরন মাহমুদ।
মিষ্টি হাসে মিমি, সব কথা কী দূর থেকে বলা যায়? কাছে আসুন।
মিরন মাহমুদ অনিচ্ছা সত্ত্বেও এগিয়ে আসে মিমির কাছে, বলুন।
আমার দরজা আপনার জন্য খোলা রইলো, যদি মনে পরিবর্তন আসে, চলে আসবেন। এবং আপনি লাভবান হবেন, মিরনের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিসিয়ে বলে সোনিয়া আখতার মিমি। আপনার জীবন আমি পাল্টে দেবো। আসুন আপনি... কাতর অনুনয় প্রকাশ পায় সোনিয়া আখতার মিমি'র গলায়।
আমার মনে হয় আমি আসবো না, একটু কঠিন রুঢ় গলায় বলে মিরন। এবং মিমির দিকে না তাকিয়ে সোজা রাস্তার দিকে হাঁটতে থাকে। এক জোড়া বাসনার চোখ আছড়ে পড়ে ওর পিঠের ওপর। কিন্তু ফিরে না তাকিয়েই হন হন করে হেঁটে প্রধান সড়কে চলে যায়। চোখের আড়াল হলে সোনিয়া আখতার মিমি গাড়ির লকারে চাবি ঢোকায়। গাড়ির দরজা খুলে যায়, বসে ড্রাইভিং সিটে। স্ট্রাট দেয়, গাড়ি চলতে শুরু করে। বুক চিরে একটা গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস বের হয়। এবং আবিষ্কার করে দু'চোখে জল।
এই মালটা তুমি ডেলিভারি দিয়েছিলে?
বিকল্প কুরিয়ার সার্ভিসের ম্যানেজারের সামনে দাঁড়িয়ে মিরন মাহমুদ। চোখে মুখে প্রবল হতাশা। বুঝতে পেরেছে ভুল ঠিকানায় ব্যাগ পৌঁছে দিয়েছে।
জী স্যার, মাথা নিচু করে উত্তর দেয়। ম্যানেজার সুলতান মাহমুদের টেবিল ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে তিনজন ডেলিভারি ম্যান।
তুমিতো লেখাপড়া জানো? জানো না?
মাথা নাড়ায়, জানি স্যার।
জানলে এই ভুল করলে কীভাবে?
স্যার বুঝতে পারছি না, এই রকম ভুলতো কখনো হয়নি আমার...
প্রশ্ন তো আমার এখানেই। ম্যানেজার সুলতান মাহমুদের কণ্ঠে রাগ, তুমি বিকল্প কুরিয়ার সার্ভিসের সব চেয়ে ভালো ডেলিভারি ম্যান। তোমাকে সব সময়ে গুরুত্বপূর্ণ ডেলিভারিগুলো দিই। শিল্পী মানুষ, তুমি ক্লাইন্ট সার্ভিস ভালো বোঝো।
স্যার! মিরনের সহকর্মী আলী বক্কর বলে, মিরন ভাইয়ের তো এমন ভুল হয় না। প্রথম বারের মতো মাফ করে দিন।
ঠিক আছে, ম্যানজারের মুখ গম্ভীর। প্যাকেটটা বাড়িয়ে ধরে মিরনের দিকে, যাও। খুব গুরুত্বপূর্ণ প্যাকেট। ঠিকানায় পৌঁছে দিয়ে এসো মিরন। কিন্তু এটাই তোমার প্রথম এবং শেষ সুযোগ। কারণ, কুরিয়ার সার্ভিসে কোনো ভুল করার সুযোগ নেই।
জি স্যার, প্যাকেটটা হাতে নিয়ে বের হয়ে আসে ম্যানেজারের রুম থেকে মিরন মাহমুদ।
আটজন ডেলিভারি ম্যানের বড় একটা রুম আছে। প্রত্যেকের ছোট ছোট চেয়ার টেবিল সাজানো। নিজের টেবিলে বসে মিরন, মুখের ভেতরটা নোনতা স্বাধে ভরে গেছে। ভীষণ অসহায় লাগছে। কোনো কিছু ভালো লাগছে না। নিজেকে ধিক্কার দেয় আবার শান্তনাও দেয় মিরন মাহমুদ। চারদিন হয়ে গেছে সোফিয়া আখতার মিমির কাছ থেকে এসেছে। চোখ আর শরীরের গহন থেকে এক পলকের জন্যও মিমিকে সরাতে পারছে না। দুই দিকে কাটছে মিরন। আমি পুরুষ বেশ্যা হবো? তাহলে গ্রামের বাড়ির নীলার কী হবে? নীলা আমার পথের দিকে তাকিয়ে আছে। প্রতিদিন মোবাইলে কতো কথা হয়, কতো স্বপ্ন, কতো বাসনা ওর, সব মিথ্যা হয়ে যাবে? অন্যদিকে একমাত্র ছোট বোন রতনার বিয়ের আয়োজন চলছে। বাবা হরমুজ আলীকে কথা দিয়েছে মিরন, রতনার বিয়ের খরচ দেবো আমি।
নীলা গত সপ্তাহে ফোনে জানিয়েছে, আমার বিয়ের কথা চলছে।
কার সঙ্গে?
আমি জানি নাকি? বাবা বলেছে, ছেলেটা মালয়েশিয়া থাকে। আমাদের উজানগাওয়ের পাশের গ্রামে মুরাদপুরে ওদের বাড়ি।
তোমার আমার সম্পর্ক নিয়ে কথা বলোনি?
কার সঙ্গে বলবো?
তোমার বাবার সঙ্গে।
বাবাকে বলতে ভয় লাগে। মাকে বলেছি—
তাই, চাচিমা কি বললো?
মা বাবার সঙ্গে আলাপ করেছে। বাবা জানতে চাইছে তুমি কতো টাকা বেতন পাও? মা বলেছে আট নয় হাজার টাকা। বাবা খুব রাগ করেছে, বলেছে এতো কম টাকার ছেলের কাছে আমার মেয়েন বিয়ে দেবো না।
কে বলেছে আমি আট নয় হাজার টাকা বেতন পাই?
তুমি কতো টাকা বেতন পাও?

অবলীলায় মিথ্যা বলে মিরন মাহমুদ, আমি বেতন পাই পনেরো হাজার টাকা।
শোনো মিরন, আমাকে অতো বোকা মেয়ে ভেবো না। তুমি যখন বছর খানেক আগে চাকরি পেয়ে বাড়িতে তোমার বাবা মায়ের কাছে চিঠি লিখেছিলে, তখন চিঠিতে লিখেছিলে আমার বেতন নয় হাজার টাকা। বলো লেখো নাই? চাচি আমাকে সেই চিঠি দেখিয়েছে।
তুমি কী বলতে চাও নীলা?
আমি কী আর বলবো! সেই চিঠির কথা মাকে বলেছিলাম। মা সেটাই বলেছে বাবাকে।
এখন উপায়?
আমি কী করে বলবো?
এক কাজ করা যায় না নীলা?
কী কাজ?
আমি আজই বাড়িতে মোবাইল করে জানিয়ে দিই আমার বেতন পনেরো হাজার টাকা হয়েছে...।
কেউ বিশ্বাস করবে না। কারণ মাত্র এক বছরে কারো বেতন এতো বাড়ে নাকি? প্রশ্ন নীলার।
তাহলে কি করা যায়?
আমি জানি না। এক কাজ করতে পারো।
উৎকণ্ঠার সঙ্গে জানতে চায় মিরন,কী কাজ?
আমাদের বাড়িতে তোমার মা বাবাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে পাঠাতে পারো।
পাঠালে তোমার বাবা মেনে নেবেন?
জানি না। কিন্তু আমি মাকে রাজি করাতে পারবো। আমি যা বলবো, মা শুনবেন নীলা। নীলা, আমি তোমাকে কতো ভালোবাসি, তুমি জানো। আমাকে কষ্ট দিও না। আমি ঢাকা এসেছি কেবল তোমার জন্য...
আমি জানি মিরন, কিন্তু বাবা তো মানবে না। আর ওই ছেলেটাও লেগেছে জান প্রাণ দিয়ে...
মানে?
যে ছেলেটা আমাকে বিয়ে করতে চায়, ওর নাম হারিস আহমেদ।
তোমাদের দেখা হয়েছে?
চুপ নীলা আখতার। কী বলবে মিরনকে? ছেলেটা মানে হারিসকে নিজে দেখেনি। কিন্তু কলেজে যাবার পথে হারিস নাকি দেখেছে। দেখেই বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছে। শুনেছে মায়ের মুখে। এতোসব বলা যায় প্রেমিকের কাছে সরাসরি? তাও মোবাইলে?
কথা বলছো না কেনো নীলা?
আসলে হয়েছে কী... একটা কৈফিয়ত দেয়ার চেষ্টা করে, আমি হারিসকে দেখিনি। কিন্তু সে আমাকে দেখেছে।
কীভাবে?
কলেজে যাবার পথে। আমি শুনেছি মায়ের কাছে। দেখেই নাকি পাগল হয়ে গেছে।
বুঝেছি নীলা... বেদনায় আর্তনাদ করে ওঠে মিরন মাহমুদের গলা।
একটু থেমে প্রশ্ন করে নীলা, কি বুঝলে?
তুমি আমার জীবন থেকে হারিয়ে যাচ্ছো। আমি আর তোমাকে পাবো না নীলা।
অসম্ভব মিরন, আমি তোমারই আছি, তোমারই থাকবো।
দেখা যাক, লাইন কেটে দেয় মিরন। খেলা শুরু হয়ে গেছে জীবনের। বড় অসহায় লাগে ওর। জীবন একটা ছোট ঝরা পাতা। জীবনের জন্য কাকে দায়ী করা যায়? কেনো জন্ম নিলাম দরিদ্র পরিবারে? বাবার কী এক বিঘা জমিও থাকতে পারতো না? মিস্ত্রি মানুষ। সারা জীবন পরের ঘরবাড়ি নৌকা বানালো কিন্তু নিজের ভালো একটা ঘর হলো না। কীভাবে হবে? মিস্ত্রিগিরি করে যা পায়, সংসার চালাতেই সব খরচ হয়ে যায়। ঘরের জন্য তক্তা, টিন, লোহা আরও কতো কী দরকার, কীভাবে জোগাড় করবে? টাকার অভাবে হলো না লেখাপড়া, অনেক কষ্টে মেট্রিক পাস করলো। ভান্ডারিয়া কলেজে ভর্তিও হয়েছিল মিরন কিন্তু বাড়ি থেকে ভান্ডারিয়া যেতে বাসে আসা যাওয়ার ভাড়াটাই জোগাড় করতে পারতো। পাসের গ্রামের গানের মাস্টার হরিপদ রায়ের কাছে কয়েক বছর গান শিখেছে। সেইটা রায় বাবু শিখিয়েছেন মাগনা। কারণ, উজানগাও হাই স্কুলের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মিরন গান গেয়েছিল, ক্লাস সিক্সে পড়ার সময়ে। গানটা ছিল, আগে যদি জানতাম দয়াল রে...।

> দুনিয়াজুড়ে শুধু নারী আর নারী। অজস্র সুন্দরী নারী। কোটি কোটি রুপবতী নারী। কিন্তু কোথাও কোনো পুরুষ নেই। কী হবে নারীদের? হাহাকারে হাহাকারে মরে যাবে না? কার জন্য সাজবে নারী? গাইবে গান? জীবনটাইতো বৃথা। তাহলে নারী ও পুরুষের পরস্পরের যে সম্পর্ক, কি সেই সম্পর্ক? হ্যাঁ অবশ্যই সম্পর্কটা প্রেমের তো বটেই, প্রেম শব্দটার আড়ালে লুকিয়ে থাকে সেক্স। কিন্তু পাশবিক সমাজ আর প্রথাবদ্ধ সংসারের কারণে নারীর সেক্স সব সময়েই আড়ালে থেকেছে। কিন্তু নারীরও শরীরে কামনার আগুন আছে। জানা গেছে, অধিকাংশ পুরুষ নারীর শরীরের কাছে হেরে যায়...

জীবনে প্রথম মাইক্রোফোনে সামনে দাঁড়িয়ে গান গায় মিরন মাহমুদ। নিজের ইচ্ছেয় গায়নি ও। গাইতে বাধ্য হয়েছিল। কচানদী থেকে উজানগাও গ্রামের মাঝ বরাবর একটা খাল উঠে গেছে ঝাউতলা, বহেরাপুর গ্রামের দিকে। এই পাড়ে উজানগাও, বিপরীত পারে তালতলা গ্রাম। দুই গ্রামের মানুষের যাতায়াতের জন্য বড় একটা কাঠের পুল রয়েছে। সেই পুলের রেলিংয়ের উপর বিকেলে বসে বসে আড্ডা মারে বন্ধুদের সঙ্গে আর গলা ছেড়ে গান গাইতো মিরন। নানা রঙের নানা পদের গান...ওর গলাটা ভালো। বন্ধুরা বেশ উপভোগ করে। এক বিকেলে পুলের উপর বসে গান গাইছিল মিরন, হাই স্কুলের নগেন মিত্র স্যার দূর থেকে যাচ্ছিল।
ও কি গাড়িয়াল ভাই...চড়া গলায় গাইছিল গান বিকেলের উদাস সময়ে কচানদীর স্রোত, ঢেউ, আর প্রবাহমান বাসাতে গোটা এলাকাটা উন্মুল হয়ে উড়ছিল। দূরে গরুর রাখালেরা, নদীর নৌকার মাঝিরা, পথের পথিকেরাও মিরনের গানের অংশ হয়ে যায়। হঠাৎ সামনে ভূত দেখার মতো চমকে ওঠে মিরন, সামনে দাঁড়ানো নগেন স্যার। নগেন স্যার সিক্সের ক্লাস টিচার।
তোর গলাটা বেশ ভালো, মৃদু হেসে বলে। গান শিখছিস নাকি?
পুলের রেলিংয়ের উপর থেকে নিচে নেমে মাথা নিচু করে দাঁড়ায়, না স্যার।
গান শিখছিস না, তাহলে এতো সুন্দর করে গাইছিস কীভাবে?
চুপ মিরন। ওর সঙ্গের বন্ধুদের একজন অখিল বন্ধু জানায়, স্যার? ওর বাড়ির কাছের চান্দু মিয়ার যে দোকান আছে, সেই দোকানের রেডিওতে গান শোনে আর ও আমাদের পরে শোনায়।

বাহ, ভগবান তোর গলায় দারুণ সুর দিয়েছেন, চলে যায় নগেন স্যার।
মাস খানেক পরে স্কুলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হলে মাইক্রোফোনে হঠাৎ এসে দাঁড়ালেন নগেন স্যার। মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে সমাবেশের দিকে তাকালো। স্কুলের সামনে বিরাট মাঠ। মাঠের পাশে বড় পুকুর। সেই মাঠের উপর বিরাট সামিয়ানা টানানো হয়েছে। বিকেলের মিহি আলো কচানদীর উপর দিয়ে এস সামিয়ানা ছুঁয়ে চলে যাচ্ছে। সবাই অবাক। উজানগাও গ্রামের লোকজন, স্কুলের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষকেরাতো আছেই, পাশের দুই চার গ্রাম থেকেও লোকজন এসেছে। অংকের শিক্ষক নগেন বাবু সাধারণত চুপচাপ ধরনের মানুষ। একটু আগে স্কুলের সভাপতির মেয়ে নজরুল সঙ্গীত শুনিয়েছে, তুমি সুন্দর তাই চেয়ে থাকি... সেকি মোর অপরাধ...।
অনুষ্ঠানের ঘোষক স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্রী দিলরুবা শবনব পরবর্তী ঘোষণা দেয়ার জন্য মাইক্রোফোন হাতে নিলে, নগেন স্যার এসে বলেন, আমার হাতে দে তো মা।
শবনব দিয়ে দেয় মাইক্রোফোন। অনভ্যস্ত হাতে মাইক্রোফোন নিয়ে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকে নগেন মিত্র স্যার মুখের কাছে নিয়ে বলে, আমি এখন আপনাদের সামনে নতুন একজন শিল্পীর পরিচয় করিয়ে দেবো। আমার বিশ্বাস, নতুন শিল্পীর গান আপনাদের ভালো লাগবে। এখন গান গাইবে ক্লাস সিক্সের মিরন মাহমুদ।
মিরন বসেছিল স্টেজের সামনের চার সারির পর একটা বেঞ্চে। সঙ্গে ক্লাসের বন্ধুরা। ওর পরনে লুঙ্গি। গায়ে ময়লা একটা জামা। কিন্তু চোখে মুখের দিব্যকান্তি অটুট। মাইক্রোফোনে নিজের নাম শুনে মিরন হতবাক। ও যে গান গাইতে পারে বাড়ির কাছের বন্ধুরা ছাড়া তেমন কেউ জানে না। নগেন স্যারের ঘোষণায় হেড স্যার আবুল কালামসহ সবাই বিরক্ত। আর মিরন?
মিরন ভয়ে বিহ্বলতায় বিমূঢ়। কোনো দিন মাইক্রোফোন হাতে নেয়নি। লোকজনের সামনে দাঁড়িয়ে কীভাবে গান গাইতে হয়, কিছুই জানে না। নগেন স্যারের ঘোষণায় অনুষ্ঠানের শত শত চোখ ওর দিকে ঘুরে তাকায়। মিরনের শরীর কাঁপছে। নগেন স্যার ডাকছে, কই এসো মিরন। এসো... হেড স্যার মঞ্চ থেকে বিরক্ত গলায় বলে, আপনি কী শুরু করলেন স্যার? ও কি গান গাইতে পারে?
একটু অপেক্ষা করেন না... তাকালো মিরনের দিকে, কই এসো।
মিরন পাথরের মতো বসে থাকে। পাশের বন্ধু নেয়ামত আর অখিল বন্ধু বেঞ্চ থেকে টেনে নামায়। বাধ্য হয়ে মঞ্চে এসে দাঁড়ায়। শরীর কাঁপছে। এসে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে নগেন স্যার হাতে মাইক্রোফোন ধরিয়ে দিয়ে বলে, ভয় কী? আমি আছি তোর পাশে। শুরু কর...
শত শত চোখ মিরনের দিকে, মিরন মরে গেছে না জীবিত বোঝা যায় না। দুই হাতের তালুর মধ্যে মাইক্রোফোনটা শক্ত হাতে ধরে ঘামছে। সময় চলে যাচ্ছে, বিরক্ত অনেক, অনেকের মনে কৌতুক, আদাবোধা ছেলেটা গান গায় নাকি!
গাইলে গাও, নইলে চলে যাও, বিরক্ত হেড স্যার বলে।
কাঁধের উপর হাতের স্পর্শ পেয়ে তাকায় মিরন মাহমুদ, পাশে দাঁড়িয়ে অভয়ের হাসিতে হাসছে নগেন মিত্র স্যার, কোনো ভয় নেই। আমি আছি তোর পাশে। গা...
কি সব আলতু ফালতু শুরু করেছে নগেন স্যার...প্রবল বিরক্তির সঙ্গে হেড স্যার চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ায়, সঙ্গে সঙ্গে মাইকে বাজে গান, আগে জানলে তোর ভাঙ্গা নৌকায় চড়তাম না...। গান শেষে প্রত্যেকে অবাক। গলা কেঁপে গেছে। কিন্তু অনেকের চেয়ে ভালো গেয়েছে। সুরেলা গলা। অনুষ্ঠানে মিরন মাহমুদ বিশেষ পুরস্কার পায় হেড স্যারের হাত দিয়ে, একটা বড় কাচের গ্লাস। জীবনের প্রথম গান গাওয়া, প্রথম পুরস্কার। বন্ধুরা তো বেজায় খুশি। একটা গান গেয়ে গোটা এলাকায় পরিচয় ছড়িয়ে পরে মিরনের নাম। পরের দিন বাড়িতে আসেন এলাকার গানের শিক্ষক হরিপদ রায়। বাড়িতে হরিপদ রায়কে দেখে অবাক হরমুজ আলী।
কী ঘটনা দাদা?
তোমারে আর তোমার ছেলেকে দেখতে এলাম।
মুখের নিচে হালাকা দাঁড়ি ঝুলছে হরমুজের। হাসে, বুঝতে পারছি আপনে কেনো এসেছেন?
তোমার ছেলে কই? গত কাল ওর গান শুনেছি। আহা কী গলা!
দুজনার কথার মধ্যে মিরন বাড়ির মধ্যে ঢোকে। গিয়েছিল পাশের বাড়ি। উঠোনে বাবার সঙ্গে হরিপদকে কথা বলতে দেখে ও পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল, খপ করে হাত ধরে হরিপদ রায়, কই যাও?
বাড়ির মইধ্যে যাই... বেশ অবাক মিরন। কোনো দিন কথা বলেনি মানুষটার সঙ্গে। উজানগাও গ্রামের এখানে ওখানে, হাটে বাজারে দেখেছে। শুনেছে হরিপদ রায় গান শেখায়, গানের শিল্পী। সেই হরিপদ রায় কেনো বাড়িতে? কথা বলছে বাবার সঙ্গে। আবার ধরেছে আমার হাত।
তুমি আমার কাছে গান শিখবা।
কোথায় শিখবো?
আমার বাড়ি যাবি, খুব ভোরে। তোর বাবায় নামাজ পরে না?
ঘাড় নাড়ে, পড়ে।
সেই সময় উঠে আমার বাড়ি চলে আসবি। আমার মেয়ে অঞ্জলি, উজানগাও স্কুলের আরও কয়েকজন ছাত্রছাত্রী আসে, প্রতি সোমবার। আসবিতো?
মিরন তাকায় পিতার দিকে।
হাসে হরিপদ, কোনো টাকাপয়সা লাগবে না। আমি শিল্পী মানুষ, মনের সুখে গাস শেখাই। গান ছাড়া কিছু ভালো লাগে না আমার। তোর গান শুনে মনে হলো, তোরে গান শেখানো আমার দায়িত্ব। তুই আমার গ্রামের ছেলে, তোর কণ্ঠের গান আমার ভীষণ ভালো লেগেছে। সেজন্য আসলাম তোদের বাড়িতে। যাবিতো শিখতে?
যামু।
ঠিক আছে, হাত ছেড়ে দেয় হরিপদ রায়।
পরের সোমবার খুব সকালে প্রায় এক কিলোটিমার হেঁটে যায় মিরন গান শিখতে হরিপদ রায়ের বাড়ি। শুরু হয় ওর জীবনের ভিন্ন একটা ধারা। সেই ধারাপাতের সূত্রে উজানগাও গ্রামের হরমুজ আলীর পুত্র নিজের মুখোমুখি।
নিজের জীবনের অলিগলি পার হয়ে মিরন মাহমুদ রিকশা থেকে নামে। ভাড়া দিয়ে ঠিকানা খুঁজে বাড়ির সামনে দাঁড়াতেই বুঝতে পারে, আবার গিলোটিনে পড়ে গেছে। সেই গুরুত্বপূর্ণ প্যাকেটটা হাতে নেই। দ্রুত ঘুরে দাঁড়ায়, তাকায় রেখে যাওয়া রিকশার দিকে। ইতিমধ্যে দেরি হয়েছে তিন চার মিনিট। রিকশা নেই। হয়তো রিকশাঅলা জানেও না, কী ক্ষতি হয়ে গেলো ওর! প্যাকেটটা রাখা ছিল পায়ের কাছে, পাদানিতে। করোটিতে বিবক্তির বহুবিদ চিন্তা ও বিচিন্তা থাকার কারণে ভাড়া দিয়ে নেমে গেছে রিকশা থেকে কিন্তু প্যাকেট নেয়া হয়নি।
এখন! কী করবো আমি? হাঁটতে শুরু করে মিরন। গোটা শরীরটা একবারে হালকা লাগছে। ঘটনা কী? কেনো আমার জীবনে এমন দুর্ঘটনা নেমে আসে? প্রথম ঘটনা নীলার বিয়ে, দ্বিতীয় ঘটনা ছোট বোন রতনার বিয়ে। আর তৃতীয় ঘটনা অফিসের গুরুত্বপূর্ণ প্যাকেট হারানো। চাকরিটা আর করা গেলো না। ইচ্ছে করছে সোবাহানবাগের বড় রাস্তার উপর বসে পড়তে। বসে পড়লে তপ্ত রোদে তাতানো রাস্তার গরমে পাছা পুড়ে যাবে। হ্যাঁ, আমার পাছা পুড়ে যাওয়াই উচিত...।
কলিং বেল বাজিয়ে অপেক্ষা করছে মিরন মাহমুদ।
প্রায় ত্রিশ সেকেন্ড পরে দরজা খুলে যায়। সামনে দাঁড়ানো সোফিয়া আখতার মিমি। চোখ মুখ দেখে বোজা যায় ঘুমিয়ে না হয় শুয়ে ছিল। মুখটা ফোলা ফোলা। পরনে গাউন। বুকের অনেক খানি খোলা। এলেমেলো চুল। ওকে দেখে একদম অবাক হয়নি মিমি।
এসো...মুখে মৃদু হাসির সঙ্গে দরজা থেকে সরে দাঁড়ায়। মিরন একবার তাকায় মিমির মুখে, মিমির মুখে তিরতিরে হাসির বান ডাকছে, ঢোকে ভেতরে।
মিমি দরজা বন্ধ করে দাঁড়ায় মুখোমুখি, আমি জানতাম তুমি আসবে।
ঘামতে শুরু করে মিরন মাহমুদ, একেবারে তুমি? ভেবে নিয়েছে আমি ওর প্রস্তাবে রাজি হয়ে এসেছি? গলা শুকিয়ে গেছে।
আমি পানি খাবো।
হাত ধরে মিমি, চলো। ড্রয়িংরুম পার হয়ে ঢোকে ভেতরে, কয়েকটা রুম পার হওয়ার পরই সোফিয়া আখতার মিমির বিশাল বেড রুম। দুনিয়ার সকল প্রকার বিলাসদ্রব্যে সাজানো। রুমে ঢুকেই মনে হলো মিরনের, কোনো মানুষের জন্য এই রুম নয়, এই রুম বেহেস্তের কারো জন্য।
নিজেই পানি ঢেলে এগিয়ে দেয় গ্লাস, নাও, পানি খাও।
মিমির হাত থেকে পানির গ্লাস নিয়ে ঢকঢক করে পানি খেয়ে গ্লাসটা

এগিয়ে ধরে, নিন।
গ্লাসটা নিয়ে রাখে ছোট টি টেবিলের উপর। ঘুরে দাঁড়ায় সোফিয়া আখতার মিমি। বসে চেয়ারে, পায়ের উপর পা তুলে। ইশারা করে সামনের চেয়ারে বসার জন্য। বসে মিরন। ঠান্ডা রুম। কিন্তু ভীষণ গরম লাগছে মিরনের। আবাও পানির তৃষ্ণায় ফেটে যাচ্ছে গলা।
আমার প্রস্তাবে রাজি তো? হালকা সুরে প্রশ্ন করে সোফিয়া আখতার মিমি। চোখের তারায় খেলা করছে উল্লাস আর ঠোঁট জোড়া কাঁপছে।
আমার একটা কথা ছিল...
বল।
আমার একটা চাকরি দরকার। যে চাকরিটা করতাম, চলে গেছে। মিরন মাহমুদ একেবারে হাজার বছরের ক্ষুধার্ত একজন তরুণের গলা চিরে বের হওয়া ক্লান্ত বিষণ্ন গলায় বলে থামে।
অবাক মিমি, চাকরি?
মাথা নাড়ে মিরন, একটা চাকরি খুব দরকার আমার।
কিন্তু আমি চাকরি কেথায় পাবো? ডান পা বা পায়ের উপর চালান করে দিয়ে চেয়ারের সঙ্গে ঠিক ঠেকিয়ে বসে, বিশাল বুক জোড়া আসমানের দিকে চেয়ে থাকে বুভুক্ষ পথিকের চোখে, আমার কী কোনো অফিস আছে? আমি কী করে চাকরি দেবো?
মরিয়া হয়ে বলে মিরন মাহমুদ, আপনি চাইলে আমার একটা চাকরি হতে পারে।
ঘাড় নাড়ে মিমি, ভুল। আমার সম্পর্কে ধারণাই ভুল। হ্যাঁ আমার স্বামী অনেক টাকার মালিক। বেশ কয়েকটা শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মালিকও। আমাকে রাখেও রাজরানীর মতো। কিন্তু ভদ্রলোক আমার কোনো কথা শোনে না। যেহেতু আমার একটা ছেলে রয়েছে, তরঙ্গ। ও থাকে কানাডায়। বাবাকে থ্রেড দিয়ে রেখেছে, আমাকে কোনো রকম বিরক্ত করলে বা তালাক দিলে খুন করে ফেলবে। সেই কারণে আমাকে কিছু বলে না। তার সঙ্গে বছরে দুই একবারের বেশি দেখাও হয় না, কথাতো অনেক পরের ঘটনা। হওয়ার প্রয়োজন নেই। চ্যানেলের মালিক, কতো জায়গা থেকে মেয়েরা আসে ওর কাছে। আমি অনেক পুরোনো হয়ে গেছি... বিষণ্ন হয়ে যায় গোটা রুম মিমির শোকার্ত শোকে। মিমি মাথায় হাত দিয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে থাকে।
মিরন কী করবে বুঝে উঠতে পারে না। শরীর অনেকটা স্বাভাবিক হয়েছে। চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ায়। রুমের মধ্যে পায়চারী করে। বুঝতে পারছে, খাঁচায় আটকে গেছে। বের হওয়ার কোনো পথ নেই। একমাত্র পথ আত্মহত্যা। নীলার বিয়ে হয়ে গেছে মালয়েশিয়ার সেই হারেসের সঙ্গে। আগামী মাসে ছোট বোন রতনার বিয়ের তারিখ ঠিক হয়েছে। প্রতিদিন দুই থেকে তিন বার ফোন করে বাবা, নয়তো রতনা।
রতনার একটাই চাওয়া, ভাইয়া বিয়ের সময়ে তুই বাড়ি থাকবি।
আদরের একমাত্র ছোট বোন। ছোটবেলা থেকে ওকে ভাইয়া বলে, সঙ্গে সঙ্গে তুইও। বেশ মজাই লাগে মিরনের। কিন্তু ছোট বোনের স্বপ্ন আটকে যাচ্ছে... বিয়েতে কমপক্ষে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে না পারে... বাবা হরমুজ আলীর তো এক টাকা খরচ করবার সুযোগ নেই। অনেক চিন্তা করে মিরন মাহমুদ এসেছিল মিমির কাছে। জানে, ওকে দেখলেই মিমি জ্বলে উঠবে। ভাববে, পরাজিত এক তরুণ সব খুইয়ে আমার কাছে আসতে বাধ্য হয়েছে। গত কয়েক দিন রাত অনেক ভেবেছে কিন্তু কোনো কূলকিনানা পায় না মিরন মাহমুদ। জন্মই আজন্ম পাপ। জন্মেছে গরিবের সংসারে। টাকার অভাবে পড়াশোনা হয়নি। গান শিখেছিল ক্লাস এইট পর্যন্ত হরিপদ রায়ের কাছে। পরে পেটের খিদেয় খান্ত দিতে হয়েছে গান। সেই গানের সূত্রে ঢাকায় এসে কয়েক মাস খুব ভালোই ছিল। গিলোটিন চ্যানেল নতুন প্রতিভার সন্ধানে জেলায় জেলায় গিয়েছিল।
বছর দুয়েক আগে পিরোজপুরেও গিয়েছিল গিলোটিন চ্যানেল গানের নতুন প্রতিভার সন্ধানে। পিরোজপুরে একটি মারামারির মামলায় হাজিরা দিতে যায় মিরন মাহমুদ, সঙ্গে বন্ধুরা। মারামারিটাও করেছিল বন্ধুরা মিলে। মারামারির সূত্রপাত হাডুডু খেলা। মিরন মাহমুদ খুব ভালো হাডুডু খেলতে পারে। বিশেষ করে ব্যাগ। প্রতিপক্ষ দলের খেলোয়াড় কোর্টের ভেতরে এলে শিয়ালের মতো নিপুণ গতিতে পিছনের পায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পরে আটকে দিতে ওস্তাদ। ফলে উজানগাও, তেলিখালী, মাদার্শী, জিউধরা, বিনাপাণী সব এলাকায় ওর ডাক পড়তো। ধীরে ধীরে উজানগাওয়ের আট নয় জনের একটা হাডুডু দল তৈরি হয়ে যায়। দলনেতা মিরন, সঙ্গী- মিজান, শালুক, কুশল, হরি নারায়ন, গৌরাঙ্গ, আবুল...।
বীনাপাণী খেলতে গিয়ে মারামারি বাধে। ওই এলাকার মেম্বারের দল হেরে গেলে এই মারামারির সূত্রপাত। মারামারিতে একজন বেশ আহতও হয়েছিল। ফলে মামলা হয়। মামলা তিন নম্বর আসামি মিরন মাহমুদ। মামলার তারিখের দিনে পিরোজপুরে এলে মাইকে ঘোষণা শোনে, পিরোজপুর এলাকাবাসী, আজ দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত গিলোটির টিভি চ্যানেলের পক্ষ থেকে নতুন প্রতিভা খোঁজার অনুষ্ঠানে আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। পিরোজপুর সরকারি হাই স্কুল মাঠের প্যান্ডেলে গিয়ে একশ টাকা দিয়ে নাম রেজিস্ট্রি করুন। ওর পকেটে ছিল আশি টাকা। বন্ধু আবুলের কাছ থেকে ত্রিশ টাকা ধার নিয়ে নাম রেজিস্ট্রি করে মিরন। যদিও নাম রেজিস্ট্রি করে কিন্তু অংশ নিতে পারবে কি না, প্রচণ্ড সন্দেহ ছিল। কারণ দুপুরের পর মামলা কোর্টে উঠবে। বিচারক যদি জামিন বজায় না রেখে জেলে ঢুকিয়ে দেয়, সব শেষ। প্রচণ্ড উৎকণ্ঠা নিয়ে আদালতের এজলাসে ওঠে মিরন ও অন্য আসামিরা। মেম্বার মোহসীন আলী ছাড়া সবাই স্কুলের ছাত্র। উকিল আদালতকে বুঝিয়ে বলার সঙ্গে বিচারক মামলাটাই ডিসমিস করে দেয়। ওরা আনন্দের সঙ্গে কোর্টের বাইরে আসে। দুপুরে না খেয়ে অপেক্ষা করে বিকেলের। বিকেলের দিকে লোকে ভরে যায় গোটা হাই স্কুল মাঠ।
একের পর এক শিল্পী যাচ্ছে, এক লাইন গাইছে, চলে আসছে। দু-একজনকে নিয়েও নিচ্ছে। প্রায় সন্ধ্যার দিকে মিলন মাহমুদের ডাক পড়ে। ওকে দেখে অবাক বিচারক ও আয়োজকরা। একমাত্র মিরনই লুঙ্গি পরে এসেছে। পিরোজপুর জেলা শহর। যারা এসেছে সবাই প্যান্ট শার্ট পরেই এসেছে।
কিন্তু যখন গান গায়, আগে জানলে তোর ভাঙ্গা নৌকায় চড়তাম না...। এইটা গাওয়ার পর আরও দুইটা গান গাইতে বলে বিচারকেরা। এবং শোনায় মিরন। মিরনকে নির্বাচিত করে কার্ড দেয়। অনুষ্ঠানের প্রযোজক ইয়াসির আহমেদ ডেকে ভেতর নিয়ে যায়। পারিবারিক অবস্থা শুনে ঢাকায় আসার জন্য এক হাজার টাকাও দিয়ে দেয়। জীবনে প্রথম এক হাজার টাকা হাতে পায়। রুমের বাইরে এসে দেখে একমাত্র আবুল ওর অপেক্ষায়, বাকিরা চলে গেছে। সেই এক হাজার টাকা পুঁজি করে মিরনের ঢাকা আসা।
গিলোটিন চ্যানেলে এসে অনেক কিছুই শিখেছে। কিন্তু এটাও বুঝেছে, কেবল চেষ্টা নয়, মামাও থাকা দরকার। প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে এসে ওকে বাদ দেয়। জানে, এটা চক্রান্ত ছিল। গ্রাম থেকে নাভাতের একটা ছেলে এসে ঢাকা জয় করুক, অনেকেই চায়নি। ফলে, মইয়ের মাথা গিয়ে ছিটকে মাটিতে পড়েছে। আর উঠে দাঁড়াতে পারেনি মিরন।
আপনি বিশ্বাস করুন, আমার ভয়ানক বিপদ।
আমি কী করতে পারি?
আপনি আমাকে সাহায্য করতে পারেন।
হাসে মিমি, আমিতো সাহায্য করতে চাই। কিন্তু তুমি তো নিচ্ছো না।
ওইভাবে সাহায্য নেয়া... থেমে যায় মিরন মাহমুদ।
এই ছেলে তুমি এতো সতীগিরি মারাচ্ছো কেনো? দুনিয়ার কোন শালায় সতী, আমাকে বলতে পারো? কেনো আমি সমস্ত লাজ লজ্জার মাথা খেয়ে তোমার মতো একটা ছেলেকে এই প্রস্তাব দিয়েছি জানো? দিয়েছি পৃথিবী কতো নোংরা হতে পারে, আমি দেখতে চাই। আমি আমার জীবনের প্রতিশোধ নিতে চাই। আমাকে যতো বঞ্চনা করা হয়েছে, সেই বঞ্চনার শোধ তুলতে চাই, হিসহিস করে ভয়াল সাপের গলায় মিমি। নিজেকে কী মনে করো? তোমার চেয়ে অনেক মেধাবী আর শিক্ষিত ছেলেরা আমার পা চাটতে চেয়েছে পোষা কুকুরের মতো। নিজেকে পবিত্র রাখবো ভেবে সবাইকে ফিরিয়ে দিয়েছি। কিন্তু তুমি... চেয়ার ছেড়ে মিরনের কাছে আসে, হাত ধরে মিমি, আমি বড় কাতর। আমাকে তুমি কাতরতা থেকে মুক্তি দাও, জড়িয়ে ধরে মিরনকে। তোমাকে দেখার পর মনে হয়েছে আমি তোমার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম...।
মিরন মাহমুদ আটকে যায় কাঁঠালের আঠার মতো। শাসালো এক নারীর অমোঘ আকর্ষণে, শরীরের কামে ও জাগরণে নিজেকে আর স্থির রাখতে পারে না। পাল্টা জড়িয়ে ধরে অনেক বছরের বুভুক্ষ নারী সোফিয়া আখতার মিমিকে।

আমি তোমাকে ক্রয় করতে চেয়েছিলাম কিন্তু আমি তোমার কাছেই বিক্রি হয়ে গেছি, সোফিয়া আখতার মিমি বলে, দুজনার প্রথম ঘটনা ঘটার ছয় সাত মাস পরে, এক দুপুরে, বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে।

হাসে মিরন, আমিও গোটা ঘটনা বিষয়ে ভাবি, ভেবে কেনো কূলকিনারা পাই না।

কেনো? কূলকিনারা না পাওয়ার কী আছে?

আমি কোথাকার কোন এক মিরন মাহমুদ। ঢাকা শহরে এসেছিলাম গান গাইতে, শিল্পী হতে। জীবনের চক্রে হয়ে গেলাম কুরিয়ার সার্ভিসের ম্যাসেনজার। আর ম্যাসেনজার হয়ে অলৌকিকভাবে পেয়ে গেলাম তোমাকে। তুমি আমার জীবটাকেই পাল্টে দিচ্ছো...

দেখো, তোমার আর আমার জীব প্রায় অভিন্ন। আমিও এসেছিলাম গান গাইতে। নিয়ে এসেছিল আমার মামা।

কোথায় এনেছিল মামা?

কোথায় আবার? এনেছিল দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়ের সূত্র ধরে তোমার গিলোটিন চ্যানেলের মালিকের দরবারে।

তাই?

হ্যাঁ, আমি তখন এসএসসি পাস করে স্থানীয় কলেজে ফাস্ট ইয়ারে ভর্তি হয়েছি। কিন্তু মা আর আমার দুজনের সংসার চালানো দায় হয়ে পড়লো। নাইনে পড়ার সময় থেকেই প্রচুর বিয়ের প্রস্তাব আসতে থাকে, কিন্তু আমার মা ছিলেন অটল। আমাকে লেখাপড়া শেখাবেন। বাবার কাছে দেয়া প্রতিশ্রুতি রাখবেন। কিন্তু বার বার বিয়ের প্রস্তাব আসা আর দারিদ্র্য দুটো মিলে মা দিশেহারা হলো। এই সময়ে মায়ের এক আত্মীয়, এনামুল মামা এলেন আমাদের বাড়িতে। শুনলো আমার গান। বললো মাকে, মিমিকে ঢাকা নিয়ে যাই আপা?

ওকে ঢাকা নিয়ে কী করবি?

ওর গানের গলা ফাইন। আমার এক বন্ধুর মামা একটা চ্যানেলের মালিক, যদি একবার গাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারি...

না, মা বেঁকে বসে। আমার আর কেউ নেই। ওকে হাত ছাড়া করতে পারবো না।

আহা, তোমার মেয়ে হাত ছাড়া হবে কেনো? ঢাকায় আমার বাসায় থাকবে। আমার বাসায় থাকাটা তোমার বাসায় থাকা নয়?

কিন্তু আমার কাছ থেকে তো দূরে থাকবে। আর আমি চাইলে মিমিকে যখন তখন দেখতে পারবো না। কথা বলতে পারবো না।

এনামুল মামা হাসেন, আপা যে কি বলেন! এখন হাতের মধ্যে সব সময় থাকে মোবাইল। প্রয়োজন মনে করলে এক মিনিটের মধ্যে তুমি কথা বলতে পারো তোমার মেয়ের সঙ্গে। শোনো আপা, আমি এতো করে কেনো বলছি জানো? বলছি তোমার কাছে না, দুলাভাইয়ের কাছে আমার অনেক ঋণ আছে। তোমার মনে আছে কি না, জানি না। আমি যখন টাকার জন্য ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার ফি দিতে পারছিলাম না, দুলাভাই কিন্তু পুরো দেড় হাজার টাকা দিয়েছিলেন। আমি পরীক্ষা দিলাম, পাস করলাম। আমার জীবনের বড় একটা ফাড়া কেটে যায়। নইলে আমি চাকরি করি, ঢাকায় থাকার মূলে তো দুলাভাইয়ের দেড় হাজার টাকা।

তিনজনের মধ্যে নেমে আসে নীরবতা।

তোর দুলাভাই কী জীবনে কম মানুষের উপকার করেছে? মায়ের গলায় অভিমান।

আপা, দুলাভাই আর কী করেছে আমি জানি না। কিন্তু আমি আমারটা জানি। আবার মনে করো না, আমি সেই দেড় হাজার টাকার ঋণ শোধ করতে আসিনি। ওই ঋণ কোনোদিন শোধ করাও যায় না। আজ তোমার বিপদ, আমি যদি একটু হেল্প করতে পারি এইটুকুই আমার চাওয়া, শেষের দিকে গলাটা ধরে আসে এনামুল মামার।

মামার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি বললাম, মা আমি যাবো।

যাবি?

হ্যাঁ যাই। আমি এই গ্রামে থেকে কী করবো? কলেজে ভর্তি হয়ে কষ্ট করে, খেয়ে না খেয়ে ইন্টারমিডিয়েট পাস করলাম। কিন্তু পাস করার পর কী করবো?

মা বিপন্ন কণ্ঠে বলেন, তুই ঢাকায় গিয়ে কী করবি?

মামা তো বললো, একটা চ্যানেলে গান গাওয়ার ব্যবস্থা করে দেবেন। যদি একবার সুযোগ পাই মা, আমি পারবো। আমার যদি ঢাকায় থাকার সুযোগ হয়, তোমাকে কী এখানে রাখবো? তোমাকেও আমার কাছে নিয়ে যাবো। দুজনে একসঙ্গে থাকবো।

বাহ, মিমিতো দারুণ সাহসী মেয়ে। মামা বলে মায়ের দিকে তাকিয়ে, আপা! তুমি আর অমত করো না।

মা রাজি হলেন, ঠিক আছে। মেয়ের ভবিষ্যৎ আমি নষ্ট করতে চাই না। কতো মানুষইতো শূন্য থেকে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে!

মা একটা দার্শনিক ভাষ্যে আমাকে ছেড়ে দিলেন এনামুল মামার হাতে। আমি এনামুল মামার সঙ্গে দুদিন পরে ঢাকায় চলে আসি। এনামুল মামার বাসা ছিল হাতিরপুলে, একটা আটতলা বাড়ির পাঁচতলায়। তিনটে রুম। মামি আমাকে গ্রহণ করেছে না বন্ধু না শত্রু এই বিভিক্তায়। আমি সব কিছুর জন্য প্রস্তুত ছিলাম। তোমাকে বোঝাতে পারবো না মিরন, আমার মধ্যে একধরেনর শক্তি ভর করেছিল। মামা সকালে অফিসে চলে যায়। আমি আর শেফালী মামি বাসায়। মামা মামির দুটো মেয়ে, কানিজ আর রিমা। কানিজ পড়ে ক্লাস ফাইভে আর রিমা টুয়ে। আমি দুজনকে পড়াতে শুরু করলাম। এবং ওদের সঙ্গে আমার একটা ভালো সম্পর্ক হলো। ওরা তখনো গ্রামে যায়নি, আমার কাছে গ্রামের নানা ঘটনা শুনে মুগ্ধ হতো। ধীরে ধীরে মামির সঙ্গে আমার একটা পরিণত সম্পর্কও হলো। আমি মামার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি, কবে এসে মামা বলবে, চল চ্যানেলে গান শোনাতে। মামা আমাকে আশ্বাস দিতে থাকেন। আমি আমার রক্ত মাংস থেঁতলে থেঁতলে অপেক্ষা করতে থাকি। গানের কী হবে জানি না, কবে হবে তাও জানি না, মাঝখান থেকে আমার ইন্টারমিডিয়েড পরীক্ষাটা দেয়া হবে না। আমি যে কী করবো ভেবে পাই না। তিন মাস পার হয়ে যাবার পরে একদিন অফিস থেকে এসে মামা বললো, পরের শুক্রবার আমাকে গান শোনাতে নিয়ে যাবে।

আমি আমি বিচিত্র ভাবনায় জারিত হলাম। আর ঢাকায় মামার বাসায় আসার পর টিভি চ্যানেলে যেসব গানের অনুষ্ঠান হতো, সেই অনুষ্ঠান দেখতাম আর শুনতাম। আমিতো একজন শূন্য মানুষ। আমার লড়াই করার মতো কোনো পুঁজি নেই, আমি জানি। সুতরাং হাতের কাছে আমি শূন্যতার মধ্যে যা পাচ্ছি, আঁকড়ে ধরছি প্রাণপণে। আর একটা বিষয়ে বলা দরকার, মামি কিন্তু শেষের দিকে আমার অনেক উপকার করেছেন। যখন শিল্পকলায় কিংবা অন্য কোথাও কোনো গানের অনুষ্ঠান হয়েছে, আমাকে নিয়ে গেছেন।

তাই?

হ্যাঁ, মানুষ পরিবর্তন হয়। যাই হোক, আমার গানের অডিশনের দিনে মামি আমাকে সাজিয়ে দিলেন তার শাড়ি দিয়ে। আমি মামার সঙ্গে এলাম ধানমন্ডি গিলোটিন চ্যানেলের মালিকের অফিসে। সেখানে আগেই অপেক্ষা করছিলো আমার বন্ধু হাফিজ আলী, যিনি গিলোটিন চ্যানেলের মালিক মোখলেসুর রহমানের বিশাল কক্ষে ঢুকলাম। বিশাল কক্ষে মোখলেসুর রহমানের বিশাল টেবিল। টেবিলের ওপাশে হালকা পাতলা মানুষটি কোটটাই পরে বসে আছে। নিচে নরম মখমলে লাল কার্পেট বিছানো। রুমের মধ্যে বেশ কয়েকজন লোক বসা। সেই সব লোকদের মধ্যে একজন চিনলাম, বিশিষ্ট শিল্পী আবির রায়হান। ভয়ে আমার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসতে লাগলো।

সোফিয়া আকতার মিমিকে জড়িয়ে ধরে মিরন, কেনো তোমার ভয় লাগলো?

ভয় লাগবে না?

জীবনে প্রথম অডিশন আমার! গ্রামের মেয়ে আমি, শহরের বিশেষ করে টিভি চ্যানেলের কোনো কিছুই আমি জানি না। তার উপর বিখ্যাত শিল্পী আবির রায়হান উপস্থিত, যার কতো গান শুনেছি আমি। যাই হোক, পরে বুঝতে পারলাম মামার সেই বন্ধু হাফিজ আলীর সঙ্গে মোখলেসুর রহমানের তুই তুই সম্পর্ক। এবং মিরন দেখো, আমি আমার ফেলে আসা জীবনের সেইসব গ্রন্থি যখন ভাবি, অবাক হয়ে যাই। আমার বাবার দেয়া দেড় হাজার টাকার পরীক্ষার ফি'র কারণে আমি কোথায় এসে দাঁড়িয়েছিলাম...

মিমি, জীবন অনেক সময় নাটককেও হার মানায়।

মানাইতো। নইলে কই তুমি, কোথাকার আমি, আজকে, এই মুহূর্তে শুয়ে আছি বিছানায় পাশাপাশি...।

সত্যিই অবাক ঘটনা।

শোনো মিরন, আমার জীবনের শ্রেষ্ট সময়ের ঘটনা। আমাকে সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন হাফিজ মামা। পরিচয়ের সময় চা নাস্তা এলো।

সবার সঙ্গে আমিও খেলাম। ওইটুকু সময়ের মধ্যে আমি আমাকে বুঝিয়ে বললাম, মিমি তোর জীবনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত এখন। ভয় পেলে চলবে না। নিজেকে উজার করে গাইতে হবে। কোথাকার কোন বিধবা মেয়ের কন্যা আমি, আমার জন্য গিলোটিন টিভির মালিক অডিশন নেয়ার জন্য বসে আছে। এই সুযোগ আমাকে কাজে লাগাতেই হবে। চা-নাস্তা খাওয়ার মধ্যে আমি অনেকটা সহজ হয়ে গেলাম। কিন্তু আমি লক্ষ্য করছিলাম গিলোটিন চ্যানেলের মালিক কাম চেয়ারম্যান মোখলেসুর রহমান আমার দিকে খুব গোপনে তাকাচ্ছে। আমিতো জানি, আমি সুন্দরী। আমাকে দেখলেই ছেলেরা লোলুপ চোখে তাকায়। সুতরাং আমি খুব একটা কেয়ার করলাম না। যথা সময়ে আমরা সবাই বিশাল কার্পেটের মেঝের উপর বসে গেলাম। আমার সামনে হারমোনিয়াম, দুই পাশে সেতার, বাঁশির বাজনাদার। একটু দূরে বসা আবির রায়হান।

উনি বললেন, শুরু কর।

আমি হারমোনিয়াম বাজিয়ে গাইতে শুরু করলাম, আমার প্রিয় শিল্পী নীলুফার ইয়াসমিনের গাওয়া আর খান আতাউর রহমানের লেখা ও সুরারোপিত গান, জীবন সেতো পদ্ম পাতার শিশির বিন্দু ... মরুভূমির বুকে যেনো এক বিষাদ সিন্ধু...। গাওয়া শেষ করে যখন তাকালাম, দেখলাম সবাই নিস্তব্ধ। আমি ভয় পেলাম, ভাবলাম, আমার গান গাওয়া হয়নি হয়তো। মামার মুখের দিকে তাকালাম, মামা নির্বিকার। মামাগো গানের কিছু জানে না। আমি কী করবো বুঝে উঠতে পারছিলাম না। ঠিক সেই সময়ে আবির রায়হান আমাকে জিজ্ঞেস করে, তুমি এই গান কার কাছে শিখেছো?

নীলুফার ইয়াসমীনের কাছে শিখেছি।

তুমি শিল্পী নীলুফার ইয়াসমীনের কাছে সরাসরি গান শিখেছো?

না, ওনাকে আমি কোথায় পাবো? আমি ক্যাসেটে, রেডিওতে, টিভিতে ওনার গান শুনে শুনে শিখেছি।

বলো কী? আবির রায়হানসহ সবাই অবাক।

বাঁশি বাজিয়েছিলেন আবদুল হাকিম ভাই। সবাই ওনাকে মান্য করে। হাকিম ভাই জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কার কার গান গাইতে পারো?

আবদুল জব্বার, সাবিনা ইয়াসমীন, জিনাত রেহানা, সুবীর নন্দী, আনজুমান আরা বেগমের গান গাইতে পারি, আমি বললাম।

ঠিক আছে তুমি আবদুল জব্বারের একটা গান শোনাও।

আমি গাইলাম আবদুল জব্বারের বিখ্যাত গান, তন্বী তরু লতা বহ্নি আঁখি, বলো না কী নামে তোমারে ডাকি...। গাওয়ার পর আগেরই মতো সবাই আমার দিকে হা করে তাকিয়ে আছে। আমি বিব্রত ঠিক কী হচ্ছে বুঝতে পারছি না। যদিও আমাকে ঘিরে আয়োজন, আমিই গান গাইছি, কিন্তু ওই রুমের কন্ট্রোল তো আমার হাতে নয়।

মোখলেসুর রহমান মুখ খুললেন, আবির? কী বলো তুমি?

আমার কিছু বলার নেই মোখলেস ভাই। লা জবাব। এই শিল্পীকে দরকার নিবিড় পরিচর্চা। আমি আপনাকে লিখে দিতে পারি মোখলেস ভাই, মিমিকে সুযোগ দিলে অনেক দূর যাবে।

বাহ! মিরন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে। কী বললো মোকলেসুর রহমান?

মোখলেস চেয়ার ছেড়ে আমাদের সামনে এসে হাঁটু মুড়ে বসে। বসে আমার কাছেই। সবাই তাকিয়ে থাকে ওনার দিকে। কারণ মোখলেস এখন ঈশ্বর আমার বাঁচার বা মরার। আমি কি করবো বুঝতে পারছিলাম না। কিন্তু ভেতরের সত্তা বলছিল, আমি এইখানে বিজয়ী হবো।

আমি এই মেয়েটির সকল দায়িত্ব নিলাম, অনেকটা সম্রাটের মতো ঘোষণা করে মোখলেসুর রহমান, আমার চ্যানেল শুরু থেকেই এই দেশের শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি বিকাশে ভূমিকা রেখে আসছে। ইতিমধ্যে আমি বেশ কয়েকজন শিল্পীকে লিফট দিয়েছি। এবং তারা এখন গানে গানে বাংলাদেশকে মাতিয়ে রাখছে। এই যে মেয়েটি, মিমি যার নাম, আমার কাছে ওর গান শোনার ব্যাপারে প্রস্তাব নিয়ে আসে আমার বন্ধু হাফিজ আলী। আমি হাফিজ আলীর কাছে মেয়েটির পরিবারের সকল ঘটনা শুনেছি। আমি খুব ব্যথিত হই যখন শুনি, অনেক প্রতিভা অনাদরে কষ্টে দিনাতিপাত করছে। প্রকৃতপক্ষে, পেটে খিদে নিয়ে আর যাই হোক, গানের বা সংস্কৃতির চর্চা হয় না। যাই হোক, মিমি এখন থেকে ঢাকায় থাকবে। ছোট্ট একটা বাসা ভাড়া করে দেবে আমার অফিস থেকে। সেই বাসায় মিমি ওর মাকে নিয়ে থাকবে, লেখাপড়া করবে, আর গান শিখবে। অসাধারণ ঘটনা! মুগ্ধ গলায় বলে মিরন মাহমুদ।

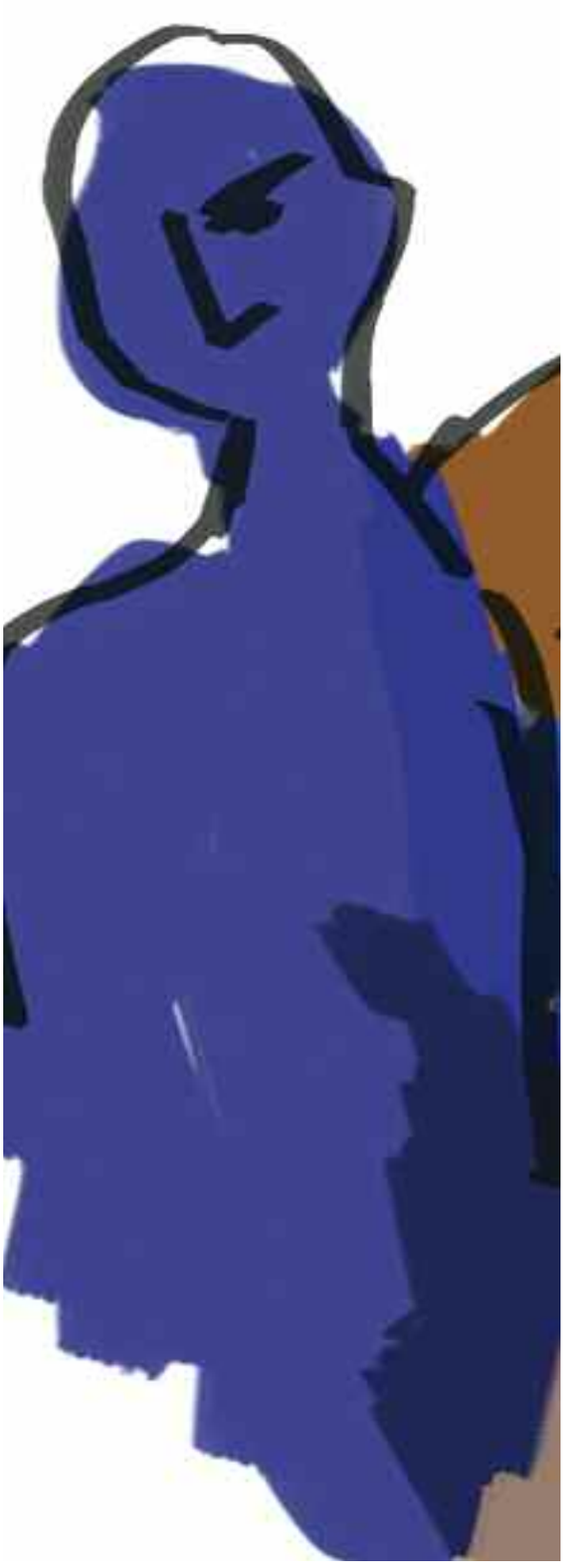

৬

মিরন কী করবে বুঝে উঠতে পারে না। শরীর অনেকটা স্বাভাবিক হয়েছে। চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ায়। রুমের মধ্যে পায়চারী করে। বুঝতে পারছে, খাঁচায় আটকে গেছে। বের হওয়ার কোনো পথ নেই। একমাত্র পথ আত্মহত্যা। নীলার বিয়ে হয়ে গেছে মালয়েশিয়ার সেই হারেসের সঙ্গে। আগামী মাসে ছোট বোন রতনার বিয়ের তারিখ ঠিক হয়েছে। প্রতিদিন দুই থেকে তিন বার ফোন করে বাবা, নয়তো রতনা। রতনার একটাই চাওয়া, ভাইয়া বিয়ের সময়ে তুই বাড়ি থাকবি। আদরের একমাত্র ছোট বোন। ছোটবেলা থেকে ওকে ভাইয়া বলে, সঙ্গে সঙ্গে তুইও। বেশ মজাই লাগে মিরনের। কিন্তু ছোট বোনের স্বপ্ন আটকে যাচ্ছে... বিয়েতে কমপক্ষে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে না পারে... বাবা হরমুজ আলীর তো এক টাকা খরচ করবার সুযোগ নেই

অবশ্যই অসাধারণ ঘটনা আমার জন্য, আমার মায়ের জন্য। মাত্র কয়েক দিনের ব্যবধানে আমার জীবনটা পাল্টে যায়। আমি একটা তিন রুমের ছোট্ট বাসায় উঠি। আমার মাকে নিয়ে আসা হয়। মাসিক একটা ভাতা পেতে থাকলাম। চ্যানেল গিলোটিনে অনুষ্ঠান করতে লাগলাম। কয়েক মাস পর পত্রিকায় আমার কভার পেজের ছবিসহ বিরাট রঙিন ছবি ছাপা হলো। আমি বা মা চাইলেই অফিসের গাড়ি চলে আসে। বাসায় নিয়ম করে দুজন গানের শিক্ষক আসতে থাকে। এইসব ঘটনার মধ্যে প্রায় এক বছর পার। মজার ঘটনা হলো, এই এক বছরের মধ্যে মোখলেসুর রহমান আমাকে কখনো রুমে ডাকেনি। এমনকি একটা ফোনও করেনি।

অবাক ঘটনা তো!

নিশ্চয়ই অবাক ঘটনাতো বটেই। আরও অবাক ঘটনা ঘটছে কিছুদিন পরই। চলে আসে পহেলা বৈশাখ। গিলোটিন চ্যানেলের পক্ষ থেকে লাইভ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় কক্সবাজারের সমুদ্র সৈকতে। অনেক শিল্পীর সঙ্গে আমিও যাই কক্সবাজারে। প্রথম বিমানে ওঠা। ভয় আর আনন্দে আমি ছিলাম ভরপুর। কক্সবাজারে আমাকে রাখা হয় তিনতারা হোটেলে। আমি আনন্দে উল্লাসে বিমূঢ়। হোটেলের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে বিশাল সমুদ্রের জলরাশির দিকে তাকিয়ে কাঁদলাম আর আমার বাবাকে ভাবলাম। আহা, বাবা আমার এই সুখ, এই বিজয় দেখে যেতে পারেনি। রাত দশটার দিকে আমার রুমের দরজায় টোকা পড়লো। আমি দরজা খুললাম। সামনে দাঁড়িয়ে মোখলেসুর রাহমান। মুখে হাসি, হাতে ফুলের বিশাল ঝাড়। আমি অবাক হলেও অপ্রস্তুত ছিলাম না।

কেনো?

আমি তো জানতাম। প্রবেশ করেছি একটি নিয়ন্ত্রিত গুহায়। এবং আমার জীবন আছে, গান আছে, আমার সুখ আছে কিন্তু আমি স্বাধীন ছিলাম না। এবং সেই রাতেই আমি আমাকে বিসর্জন দিলাম মোখলেসুর রহমানের কাছে, গলাটা আর্দ্র সোফিয়া আখতার মিমির।

শোয়া থেকে উঠে বসে মিরন মাহমুদ, এতোক্ষণে বুঝেছি।

কী বুঝেছো?

কেনো তোমার জন্য এতোসব করছিল ভদ্রলোক!

স্বাভাবিক। এতো টাকা ঢালবে আর আমাকে উপভোগ করবে না, শিল্পের পৃথিবীতে এটা অন্যায়। আমিতো শেষ পর্যন্ত মোখলেসুরের স্ত্রী হতে পেরেছি, কতো মেয়ে কেবল ভোগের শিকার হয়ে কাঁদতে কাঁদতে চলে গেছে, শেষ নেই। এবং আমরা এক বছর পর বিয়ে করলাম। কারণ, আমার পেটে সন্তান এসেছে। নানাভাবে আমাকে প্রলুব্ধ করা হয়েছিল, যাতে অ্যাভরেশন করি। আমি বলেছিলাম, মৃত্যুই হতে পারে একমাত্র অ্যাভরেশন। বুঝতেই পারো, আমার জীবন আমার কাছেই সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। ছেলে তরঙ্গ হলে গান-বাজনা ছেড়ে দিয়ে, ওকে নিয়েই আমার সময় কেটে যায়। বুঝে গেছি আমার আর কিছু হবে না। দেশে বিদেশে অনেক ঘুরেছি, দেখেছি। শুনেছি মোখলেসুর রহমানের নারীঘটিত নানা কেচ্ছা। ও নিয়ে আমার বলার কিছু ছিল না। আমিতো খেয়ে পড়ে ভালোই আছি। যা আমার পাওয়ার ছিল না, তার চেয়ে অনেক বেশি পেয়েছি। কিন্তু নারী হিসেবে নিজের মধ্যে একধরনের প্রতিশোধের হলকা কাজ করছিল। মিরনকে জড়িয়ে ধরে মিমি, বলো তুমি মিরন, আমি কী ফুরিয়ে গেছি?

না, তুমি চিরকালের আগুন।

অথচ আজ বারো তোরো বছর স্বামীর স্বাদ পাই না। আমার পেতে ইচ্ছে করে না? বলো করে না?

নিশ্চয়ই করে... তুমি চির সবুজ, চির সুন্দর।

আহা মিরন, জড়িয়ে চুমু দিতে থাকে একের পর এক। চুমু দিতে দিতে এক সময়ে ওকে জড়িয়ে বুকের মধ্যে মাথা রেখে কাঁদতে শুরু করে মিমি, আমি জানি তুমি আমাকে যতোই ভালোবাসো কিন্তু মনে মনে ভাবো আমি একটা খারাপ মহিলা। আমি তোমাকে কুড়িয়ে এনে টাকার বিনিময়ে শরীর ভোগ করছি...।

চুপ মিরন মাহমুদ।

উঠে বসে সোফিয়া আখতার মিমি, আমার ধারণা সত্যি না?

কীসের ধারণা?

তুমি ভাবছো আমি খারাপ মহিলা!

মিরন জড়িয়ে ধরে সোফিয়া আখতার মিমিকে, তোমার ধারণা সত্যি। আমি তোমার ফোন পেয়ে চলে আসি। তোমার বাসায় থাকি ,খাই আর তোমার সঙ্গে শারীরিক রঙ্গ করি। যাবার সময়ে আমাকে পাঁচ হাজার দশ হাজার টাকার একটা প্যাকেট দাও। এমনকি তুমি ঈদের বোনাসও দিয়েছো। আমাকে ব্যবসায় ঢুকিয়েছো, আমাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাও তুমি। এতো কিছুর পরও তোমাকে সত্যি মনে মনে এক ফোটা হলেও ঘৃণা করতাম, যদিও তোমার কারণে আমার জীবনে, বাবা মায়ের সংসারে স্বাচ্ছন্দ্য এসেছে। কিন্তু তুমি আজ যে ঘটনা শোনালে, তাতে তোমাকে বিন্দু পরিমাণও ঘৃণা করলে আমার পাপ হবে। তুমি এক অসামান্য নারী... এবং তোমার প্রতিশোধ নেয়ার অধিকার আছে। কারণ, তুমি ফুরিয়ে যাওনি। তুমি এখনও রুপসীতো বটেই, প্রবলভাবে আবেদময়ীও।

আর বলো না মিরন, আমি পাগল হয়ে যাবো।

সোফিয়া আখতার মিমির সহায়তায় উজানগাও গ্রামের হজরত আলীর পুত্র মিরন মহিউদ্দিন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। পিছনে বুদ্ধি, প্রেরণা দিয়েছে মিমি। দুজনের মধ্যে এই সম্পর্কটা চলে প্রায় পাঁচ বছর। ততদিনে মিরন অর্থনৈতিকভাবে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। বছর খানেক আগে সোফিয়া আখতার মিমি'র ক্যান্সার ধরা পড়েছে। চিকিৎসা চলছে। আর গোপন অভিসার গোপন রাখতে মিমি দূরে সরিয়ে দেয় মিরনকে। জীবনের এই গোপন প্রতিশোধ বা উপভোগ গোপনই রাখতে দুজনে। শারীরিকভাবেও রঙ্গে সমর্থ ছিল না মিমি। ব্যবসায়ও ব্যস্ত হয়ে পড়ে মিরন। এবং বছর খানেকের মধ্যে দুজনে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

মিরন বিদেশ গিয়েছিল ব্যবসার কাজে। দেশে এসে পত্রিকার পাতায় সোফিয়া আখতার মিমির মরণ সংবাদে চলে আসে বাসার সামনে, সেখান থেকে কবরস্থানে।